বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা

শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল



জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৬৩
মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রণ :
শ্রীবিভাষকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯

পরিচিতি

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগেব প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বর্তমানে সংস্কৃত কলেজেব গবেষণা বিভাগেব অধ্যক্ষ ডাঃ সুশীল কুমাব দে এম-এ, পি-আব-এস, ডি-লিট (লণ্ডন) মহোদয লিখিত]

এই গ্রন্থটি আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ হিংমাণ্ডচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম সাহিত্যিক প্রযাস। যে উদ্দেশ্যে তিনি লিখিযাছেন তাহা তিনি নিজেই বিবৃত করিযাছেন। প্রত্যেক গ্রন্থই আপন পরিচয আপনি বহন করে এবং অন্যের দ্বারা পরিচয বাহুল্য মাত্র ; তথাপি বাঙালী পাঠক সমাজে ইহাকে পরিচিত করিবার ভার আমি লইযাছি, তাহার কারণ শুধু স্নেহেব পক্ষপাতিত্ব নয, এই রূপ রচনার প্রযোজন আছে বলিযাই আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থকার বলিযাছেন, বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা করিযা তিনি যে আনন্দ পাইযাছেন, সেই আনন্দ সংক্রামিত করিবাব উদ্দেশ্যই তাঁহাকে লিখিবাব প্রেরণা দিযাছে। এরূপ নিস্পৃহ কামনা প্রশংসার যোগ্য এবং আশাকরি তাহা সফল হইবে। লেখকের অনুভূতি যদি সত্য হয, তবে পাঠকের মধ্যেও তাহা সংক্রামিত হইবে, সন্দেহ নাই। পড়িতে পড়িতে মনে হইযাছে, গ্রন্থকাব অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্বেব অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু "এহ বাহ্য"। চৈতন্য জীবনীব আলোচনায ও বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদনে তিনি যে আনন্দের কথা বলিযাছেন তাহাই পবিস্ফুট হইযাছে, এবং তাহাই তাঁহার রচনার প্রধান আকর্ষণ। তিনি কেবল পণ্ডিতের মন লইযা লিখেন নাই, রসিকের প্রাণও তাহাকে প্রেরিত কবিযাছে। তাই সংবাদের সহিত রসবিচারেরও সমন্বয ঘটিযাছে।

গ্রন্থের দোষগুণের বিচার এই সংক্ষিপ্ত পরিচযেব উদ্দেশ্য নয, সে দাযিত্ব বিশেষজ্ঞের। আমি শুধু এইটুকু বলিযা ক্ষান্ত হইব যে, সহজ ও সরল ভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্যের মূল কথাগুলি বাঙালী পাঠকের গোচর করিবার প্রযোজন আছে, এবং সে প্রযোজন বর্তমান রচনার দ্বারা অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে বলিযা আমি মনে করি।

শ্রীসুশীলকুমার দে

নিবেদন

বৈষ্ণব রস-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত ও বহু সুচিন্তিত সমালোচনা-সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও আবার আমি কেন ইহার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহার একটা কৈফিয়ৎ পূর্ব্বাহ্ণেই দেওয়া আবশ্যক। মানুষের স্বভাব ধর্ম্মই হইল সে একাকী তাহার ভালোলাগাকে লইয়া থাকিতে পারে না। অপরের অন্তরেও সেই ভালোলাগাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়,—জগতে সমস্ত শিল্প-সাহিত্য ইতিহাস-বিজ্ঞান ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। বৈষ্ণব পদাবলী আমার মনকে মুগ্ধ করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে আমি দশজনের মুগ্ধ হৃদয়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টা করিয়াছি—ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।

এ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-পদাবলীর যাহা কিছু সমালোচনা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তিতে,—নিছক রসতত্ত্বের আলোচনা সেখানে বড় একটা স্থান পায় নাই। অথচ বৈষ্ণব-কবিতার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিতে বসিয়া রসতত্ত্বকে আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না। এই কারণেই আমি এখানে দর্শন, রসতত্ত্ব এবং ইতিহাস—তিনটিকেই সমান মর্য্যাদায় গ্রহণ করিয়াছি এবং এই তিনের সহায়তায় বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার প্রচেষ্টাও করিয়াছি। সে সিদ্ধান্ত কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহা বিচার করিবার জন্য রসবেত্তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

প্রকৃত ভক্ত ও রসিকের নিকট বৈষ্ণব-পদাবলীর এই বিশ্লেষিত রূপের হয়ত কোনো মর্য্যাদা হইবে না, কিন্তু সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজে ইহা বোধ হয় আদরণীয় হইবে এবং তাঁহাদের অনেক অসুবিধাও হয়ত দূর হইবে। বৈষ্ণব পদাবলীর রসতত্ত্ব বিচার, বিশ্লেষণ ও আস্বাদনে যদি এই গ্রন্থ হইতে তাঁহারা কিছু মাত্র সাহায্য পান, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুশীলকুমার দে এম-এ, পি-আর-এস্, ডি-লিট্, (লণ্ডন), মহোদয়ের নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থের বহু স্থানে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করি। তিনি তাঁহার বহুমূল্য

সময় নষ্ট করিয়া এই গ্রন্থের একটি পরিচিতিও লিখিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সাফল্যের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আশুতোষ কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনিই এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমাকে সর্ব্বপ্রথম উৎসাহ দেন। তাঁহার নিজের বহু গ্রন্থ আমাকে অযাচিতভাবে পড়িতে দিয়া, নানাস্থান হইতে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এবং নানারূপ আলোচনা করিয়া তিনি আমাকে সাহায্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহা' গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে দিয়া ও নানারূপ আলোচনা করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। উভয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর একজনের কথা উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। আমার প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী গোপাহেমাঙ্গী চৌধুরী বি-এ, এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে—তাহার প্রেরণা, উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই গ্রন্থ শেষ করা সম্ভবপর হইত না। ৺রাধামাধব তাহাকে শান্তি, সুখ ও প্রতিষ্ঠা দান করুন, তাঁহার চরণে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা রসজ্ঞ পাঠকসমাজে আদৃত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিবার সাহস করিয়াছি। সামান্য পরিবর্তন ও একটি নূতন পরিশিষ্ট এই সংস্করণে দেওয়া হইল। আশাকরি, প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণও রসিক পাঠকসমাজে আদৃত হইবে।

হিমাংশু চৌধুরী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলার বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত মতবাদ। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ, বিশেষ করিয়া রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী তাঁহাদের দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা সেই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্‌চৈতন্য যুগেও বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল। শুধু বাংলাদেশে কেন, সমস্ত ভারত জুড়িয়াই তাহা প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারাযণ, হরি প্রভৃতিকে আজ আমরা অভিন্ন বলিযা জানি। কিন্তু আদিতে ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক সত্তা ছিল,—কালক্রমে ইহারা অভিন্ন হইয়াছেন। বৈদিক যুগে বিষ্ণু ছিলেন সৌরদেবতা। মহাভারতে নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায এবং দৈবকীপুত্র বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে সেখানে দেবতার পর্য্যাযে উন্নীত হইয়াছেন,—তাহারও প্রমাণ পাওযা যায। বিষ্ণুর কল্পনায় যে কয় প্রকাব মতবাদের সংমিশ্রণ হইযাছে, তাহা লইযা পণ্ডিত-সমাজ একমত নহেন। তবে বৈদিক বিষ্ণু যে সৌর দেবতা, সে বিষযে পণ্ডিত-সমাজ একরূপ নিঃসন্দেহ। ঘোব আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ ও দৈবকীপুত্র কৃষ্ণ অভিন্ন কিনা তাহা লইযাও পণ্ডিত-সমাজে মতভেদ আছে।

বিষ্ণুর স্তুতি ও তাঁহার উপাসনা বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সম্বন্ধে আমরা অনেকগুলি মন্ত্র পাই। তাহার মধ্যে একটি এই—

> ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রিধানিদধেপদং সমূলূহমস্য পাং সুরে।
> ত্রীনি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্ম্মানি ধারযন্ ॥১,৯৯,৩॥

এই ভূমণ্ডলে বিষ্ণু বিচরণ করিয়াছিলেন, তিন স্থানে তিনি পদস্থাপনা করিযাছিলেন, তাঁহার পদচিহ্ন (বা ভূমণ্ডল) তাঁহার চরণের ধূলিতে আবৃত; অজেয় পালক বিষ্ণু তিন পদ অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং (তাহাতে) ধর্ম রক্ষিত হয়। শাকৃপাণি এই তিন পদকে পৃথিবীস্থ অগ্নি, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ এবং সূর্য্য—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য মনে করেন যে, বিষ্ণুর এই ত্রিপাদের উপরেই পৌরাণিক বামন অবতারের বীজ রহিয়াছে।

বৈদিক এই বিষ্ণু সূর্য্যেরই প্রতীক বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন (১)। বৈদিক যুগের প্রথমে বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে পরিগণিত হন নাই (২)।

ব্রাহ্মণ্যযুগের বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু উচ্চতর সম্মান লাভ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণু ও যজ্ঞকে এক করিয়া ধরা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ত্রিপাদ অতিক্রম করিয়া বিষ্ণু দেবতাদের জন্য অসীম ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪শ কাণ্ডে একটি উপাখ্যান দেওয়া আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেবতাদের সহিত কলহ করিয়া বিষ্ণু জয়লাভ করেন, কিন্তু দেবতারা কৌশল করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন এবং তাঁহারই ছিন্ন শির আকাশে সূর্য্যরূপে শোভা পাইতেছে! তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এইরূপ আখ্যান পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা সর্ব্বপ্রথম নারায়ণের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু সেখানে নারায়ণ ও বিষ্ণু ভিন্ন ব্যক্তি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কিন্তু বিষ্ণু ও নারায়ণের সংযোগ-সাধন করা হইয়াছে (৩)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই যে, বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন,—

অগ্নির্বৈদেবানান্ অবম বিষ্ণুর্পরমঃ (ঐ. ব্রা, ১,১)॥

এবং সেখানে তিনি দীক্ষার প্রতিপালক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের সহায়ক হিসাবেও আমরা বিষ্ণুকে দেখিতে পাই। কিন্তু এ সত্ত্বেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে "দেবানাম দ্বারপঃ" (১,৩০) বলায় মনে হয় যে, সর্ব্ববাদী-সম্মতভাবে তিনি তখনও শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিকল্পিত হন নাই (৪)। ব্রাহ্মণ্যযুগের বিষ্ণু-উপাসনার সহিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত কোনো যোগসূত্র নাই (৫)।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে আমরা 'বৈষ্ণব' আখ্যাটির কোনো পরিচয় পাই না। ব্রাহ্মণ্যযুগে বিষ্ণু যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত, কিন্তু ভক্তি ও প্রসাদের সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণব নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন উল্লেখ বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। মহাভারতে আমরা প্রথম 'বৈষ্ণব' আখ্যাটির সহিত পরিচিত হই। ডক্টর সুশীলকুমার দে মনে করেন যে, পরবর্ত্তী কালে 'বৈষ্ণব' বলিতে আমরা যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া থাকি,

মহাভারতে বৈষ্ণব আখ্যাটিতে খুব সম্ভব সেইরূপে কোনো বিশেষ অর্থ বুঝাইত না। বিষ্ণুর উপাসক বলিতে 'বৈষ্ণব' আখ্যাটি মাত্র তিন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে একটি ফলশ্রুতিতে—

অষ্টাদশ পুরাণাম্ শ্রবণাদ্ যৎ ফলম্ ভবেৎ।
তৎফলম্ সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবোনাত্রসংশয়ঃ॥ (৬) (১৮, ৬, ৯৭)

অধ্যাপক ভিণ্টারনিজের মতে মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের মধ্যে বর্ত্তমান আকারে সম্পাদিত হইয়াছে (৭)। প্রাচীন মুদ্রা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে 'পরমবৈষ্ণব' উপাধির প্রচলন ছিল (৮)। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত-সম্রাটগণ নিজেদের 'পরমভাগবত' বলিতেন, 'পরমবৈষ্ণব' নহে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি ভক্তি এবং করুণাময় ভগবানের পরিকল্পনা; কিন্তু বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্যে এইরূপ ভক্তির কোনো নিদর্শন আমরা পাই না।

মহাভারতে আমরা 'বৈষ্ণব' কথাটির উল্লেখ পাই, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ভীষ্মপর্ব্বের বিশ্বোপাখ্যানে এবং শান্তিপর্ব্বের নারায়ণী-অংশে আমরা ভাগবত, সাত্বত এবং একান্তিক বা পঞ্চরাত্র ধর্ম্মের উল্লেখ পাই। গীতাতেও ভক্তিসম্বন্ধে যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। গীতা, বিশ্বোপাখ্যান এবং নারায়ণী-অংশের রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় শতকের পূর্ব্বে যে ভাগবতগণের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। পূর্ব্ব-মালবের বেসনগর (প্রাচীন বিদিশা) হইতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতকে যবনরাজ এণ্টিয়ালকিডাসের (Antialkidas) রাজদূত ভাগবত হেলিওডেরা বাসুদেবের সম্মানার্থ একটি গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ের অল্প পরবর্ত্তী যুগের আরও দুইটি শিলালেখ বেসনগরে পাওয়া গিয়াছে। একটিতে জানা যায় যে, ভাগবত গৌতমীপুত্র একটি গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অপরটিতে বাসুদেবপুত্র প্রদ্যুম্নের লাঞ্ছন মকরধ্বজা আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। মোর নামক স্থানে কূপে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে বৃষ্ণিবংশীয় পঞ্চবীরের জন্য পাথরের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ঐ শিলালেখ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের এবং ঐ পঞ্চবীরের নাম যথাক্রমে বলভদ্র, বাসুদেব প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও

অনিরুদ্ধ (৯)। রাজপুতানায় উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত গোসাণ্ডি নামক স্থানে আর একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভাগবত সঙ্কর্ষণের জন্য একটি প্রস্তর দেউল নির্ম্মিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে, ইহা বেসনগরের প্রথম শিলালেখের পূর্ব্ববর্ত্তী। দাক্ষিণাত্যের নানাঘাটে প্রাপ্ত শিলালেখে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের প্রশস্তি দেখা যায় (১০)। এই সমস্ত শিলালিপিতে বাসুদেবের ভক্তগণকেই 'ভাগবত' রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

পাণিনি তাঁহার 'অষ্টাধ্যায়ী'তে বাসুদেবের ভক্তকে 'বাসুদেবক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ডাক্তার হেম রায়-চৌধুরী মনে করেন যে, পাণিনি খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতকে তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী রচনা করিয়াছিলেন (১১)। সুতরাং পাণিনির পূর্ব্বেই, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকের পূর্ব্বেই ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বাসুদেবের ভক্ত ও ভাগবত-ধর্ম অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। দাক্ষিণাত্যের আলবারগণও খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে ভক্তি ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন এবং তাঁহারা ভাগবত বা বাসুদেবক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সুতরাং বাসুদেবই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও বৈষ্ণবদিগের মূল ভিত্তি। যদিও বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করেন, তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতবাদই রামানুজ-প্রবর্ত্তিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামানুজ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আলবারদিগের মতবাদের উপরে তাঁহার স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আবার রামানুজের পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভাগবতগণেরই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে 'ভাগবত' বলিতে আমরা গোসাণ্ডি ও বেসনগরের শিলালেখে উল্লিখিত 'ভাগবত'দের বুঝাইতেছি।

বাসুদেবের প্রতি ভক্তি হইতেই ভাগবত-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। সুতরাং বাসুদেব সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এবং তিনিই বাসুদেব—এই বিশ্বাসের উপরেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি। স্বয়ং ভগবানের ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নহে, তাহা অশোভন। কোনরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কাহারও বিশ্বাসের প্রতি কোনরূপ অমর্য্যাদা না করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম্মপুস্তক ও শিলালেখ হইতে বাসুদেব সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তাহার আলোচনা করিব। সুতরাং আমার আলোচনায় ভগবান বাসুদেবের কথা থাকিবে না, ঐতিহাসিক বাসুদেবের কথাই থাকিবে। ইহাতে যাঁহারা বাসুদেবের

ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসে কোনরূপ আঘাত লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি না।

বৈদিক সাহিত্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আমরা বাসুদেবের উল্লেখ পাই—"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" এখানে বিষ্ণুর অপর নাম যে বাসুদেব—ইহা জানিতে পারি। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করেন যে, তৈত্তিরীয় আরণ্যক অর্ব্বাচীন এবং উপনিষদের খিলরূপ বা পরিশিষ্ট (১২)। কোন সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা উচ্চশ্রেণীর উপনিষদে বিষ্ণুকে বাসুদেব বলিযা উল্লেখ করা হয নাই।

গীতায বাসুদেবকে বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা হইযাছে,—"বৃষ্ণিনাম্ বাসুদেবোঽস্মি।" তৈত্তিরীয সংহিতা (৩ ; ১১, ৯, ৩), তৈত্তিরীয ব্রাহ্মণ (৩ ; ১০, ৯, ১৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (৩, ৯, ১, ৪), জৈমিনীয উপনিষদ ব্রাহ্মণ (১, ৬, ১), পাণিনির অষ্টাধ্যাযী (৪, ১, ১১৪) এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা বৃষ্ণি-বংশের উল্লেখ পাই।

ঘত-জাতক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মথুরায রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাসুদেব,—কিন্তু বংশের নাম সেখানে নাই। ঘত-জাতক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, কহ্নদিপাযনের প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য বাসুদেবের বংশ ধ্বংস হইযাছিল। উক্ত জাতকে বাসুদেবের 'কহ্ন' উপাধিও দেখা যায়।

জৈন শাস্ত্র "উত্তরাধ্যাযন" হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাসুদেব ক্ষত্রিয়বংশের একজন রাজা ছিলেন।

মহাভারতে বাসুদেব বসুদেবের পুত্র বলিযা পরিগণিত হইলেও, বাসুদেবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্যপ্রকারও করা হইয়াছে।

যেমন,— (১) বসনাৎ সর্ব্বভূতানাম্ বসুত্বাদ্দেবযোনিতঃ।
বাসুদেবস্ততো বেদ্যো বৃহত্ত্বাদ্‌বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ (৫,৭০,৩)
(২) ছাদায়ামি জগৎ বিশ্বম্ ভূত্বা সূর্য্য ইবাংশুভিঃ।
সর্ব্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোহ্যহম্ ॥ (১২,৩৪১,৪১)

মহাভারতে আমরা দুইজন বাসুদেবের উল্লেখ পাই। একজন পৌণ্ড্র দেশের অধিপতি,—তিনি নকল। মথুরার বৃষ্ণি, যাদব বা সাত্বত বংশোদ্ভব বাসুদেব, যাঁহার অপর নাম কৃষ্ণ,—তিনিই প্রকৃত বাসুদেব।

স্যার আর জি ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, মহাভারতের বাসুদেব যাদব,

বৃষ্ণি বা সাত্বত নামক ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব এবং কৃষ্ণ একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। ইঁহারা উভয়ে ভিন্ন পুরুষ, কিন্তু কালক্রমে উভয়কে একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া অভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে (১৩)। কিন্তু ডাঃ কিথ উভয়কে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (১৪)। ডাঃ হেম রায়-চৌধুরী কিথের মত গ্রহণ করিয়াছেন (১৫)। আমাদের মনে হয়, এই মতই গ্রহণযোগ্য।

পাতঞ্জলের মহাভাষ্যে আছে যে কৃষ্ণ তাঁহার মাতুলকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অপর নাম ছিল বাসুদেব,—"অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ এবং জঘান কংসম্ কিল বাসুদেবঃ।"

গ্রীক লেখক মেগাস্থিনিস ও এরিয়ানের রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শৌরশেনোই নামে ভারতীয় এক উপজাতি হেরাক্লাস নামক এক ব্যক্তিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের মেথোরা ও ক্লেইশোবরা নামে দুইটী বৃহৎ নগর ছিল (১৬)। ডাঃ ভাণ্ডারকর 'শৌরশেনোই'র সহিত সাত্বতদের এবং 'হেরাক্লাসের' সহিত কৃষ্ণকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (১৭)। লাসেন, ম্যাকক্রিণ্ডেল ও হপকিন্স্ 'মেথোরা'কে মথুরা এবং 'ক্লেইশোবরা'কে কৃষ্ণপুর বলিয়া মনে করেন (১৮)। যাই হোক, মেগাস্থিনিস ও এরিয়ানের বৃত্তান্ত হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, সাত্বতবংশের সহিত কৃষ্ণের যোগ ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ ঘোষ আঙ্গিরসের নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন—অর্থাৎ, "তপোদানমার্জ্জবম্ অহিংসা সত্যবচনম্" (৩, ১৭, ৪) তাহাই আবার গীতায় তিনি অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিতেছেন (১৬, ১—২)।

ঋগ্বেদে বিষ্ণুসম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"ত্রিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ" (১, ২২, ১৮)। "গোপা" শব্দের অর্থ গোরক্ষক বা গোপালক উভয়ই হইতে পারে। ঋগ্বেদে (১, ১৫৪, ৬) আরও বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর চরণ যে সর্ব্বোচ্চ স্থানটীতে পৌঁছায়, সেইখানে শৃঙ্গযুক্ত দ্রুতগামী বহু গাভী আছে। গোপাল, গোবিন্দ, গোপেন্দ্র প্রভৃতি কৃষ্ণের যে সকল উপাধি বা নামের কথা আমরা জানি, সে সমস্তেরই মূলে ঋগ্বেদোক্ত "গোপা" শব্দটি আছে বলিয়া মনে হয়। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে বিষ্ণুকে গোবিন্দ ও দামোদর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাঁহাকে কৃষ্ণ বা বাসুদেব বলা হয় নাই।

প্রাক্-মহাভারতীয় সাহিত্য হইতে কৃষ্ণের মানবীয় সত্তারই পরিচয় পাওয়া

যায়। ছান্দোগ্য-উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদগুলির অন্যতম (১৯) এবং বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী (২০)। বৌদ্ধ ঘত-জাতকে এবং জৈন উত্তরাধ্যায়ন-সূত্রেও কৃষ্ণের মানবীয় সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলা হইয়াছে,—"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়োক্ত্বোবাচা পিপাস এব স বভূব"......(৩, ১৭, ৪)। ছান্দোগ্য-উপনিষদের কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণকে দেবকীপুত্র বলা হইয়াছে, মহাভারতেও কৃষ্ণকে দেবকীপুত্র বলা হইয়াছে (১, ১৯০, ৩৩; ২, ২৯, ৪৬ এবং আরও অনেক স্থানে)। মহাভারতে কৃষ্ণকে অনেকবার 'অচ্যুত' বলা হইয়াছে, আবার উক্ত উপনিষদের অনেকস্থানেও ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্যকে 'অচ্যুত' বলা হইয়াছে। উপনিষদোক্ত ঘোর আঙ্গিরসের সহিত ভোজবংশের এবং ভোজবংশের সহিত কৃষ্ণের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহা মহাভারত হইতেই জানা যায়। উপনিষদের কৃষ্ণ এবং তাঁহার গুরু ঘোর আঙ্গিরস—উভয়েই সূর্য্যোপাসক ছিলেন। শান্তিপর্ব্বে কৃষ্ণ যে সাত্বতবিধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল—একথা মহাভারতকার বলিয়া গিয়াছেন,—"প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতঃ।" কর্ণপর্ব্বে কৃষ্ণ আঙ্গিরস-শ্রুতিকে উত্তম শ্রুতি বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন,—"শ্রুতিনামুত্তমা শ্রুতি।" আঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তপ, দান, আর্জ্জব, অহিংসা এবং সত্যবচনের গুণাবলী শিখিয়াছিলেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে আমরা অনুরূপ শিক্ষা দিতে দেখিতে পাই।

দানম্ দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বধ্যায়ম্ তপঃ
আর্জ্জবম্ অহিংসা সত্যম্......
(ভগবদ্গীতা ১৬, ২)

এই সকল সাদৃশ্য হইতে মনে হইতে পারে যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ এবং উপনিষদের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি—এবং এ মত অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ডাঃ সুশীলকুমার দে মনে করেন যে, পুরাণের ঐতিহ্য অনুসারে এই দুই কৃষ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার মতে, বৈদিক কৃষ্ণ ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যে অভিন্ন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, আর যে সমস্ত তথ্য পাইলে আমরা উভয়কে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম, সে সমস্ত তথ্যেরও অভাব আছে। গীতার কৃষ্ণ উপনিষদ হইতে গৃহীত হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু তাঁহার মতে ঘোর

আঙ্গিরসের তত্ত্ব গীতায় পাওয়া যায় এক্থা বলিলে অন্যায় করা হইবে। সৌরধর্ম্মের উপর গীতার ভিত্তি এরূপ অনুমানও অসঙ্গত। ডাঃ দে আরও বলেন যে, মহাভারতে যে বিষ্ণুর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাকে নিঃসন্দেহে সৌর দেবতা বলিয়া ধরা যায় না। বিষ্ণুর সহিত আদিতে সূর্য্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকিলেও বৈষ্ণব মত সৌর মতের উপর প্রতিষ্ঠিত—এমন কথা বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম নানামতের মিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিষ্ণু, হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব ইত্যাদি—বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অধিনায়ক ছিলেন। কালক্রমে ইহারা যেমন বৈষ্ণব মতের মধ্যে আসিয়া সংহত হইয়াছেন, তেমন সৌরধর্ম্মমতও বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিযা মিশিয়াছে। অতএব সৌর ধর্ম্মমত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম সূক্ষ্ম উপাদান মাত্র।

মহাভারতের কৃষ্ণ মানব। যদিও সেখানে কৃষ্ণ দেবপদবাচ্য হইযাছেন, তথাপি কোন কোন স্থানে মানব শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইযাছে। মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তীযুগে যে শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় সত্তা ছিল, তাহারও পরিচয় মহাভারতেই পাওয়া যায়,—

অহং হি তৎ করিষ্যামি
পরম্ পুরুষকারতঃ।
দৈবন্তু ন ময়া শক্যম্
কর্ম্মকর্ত্তুম্ কথঞ্চন ॥ (মহা, ৫, ৭৯, ৫-৬)।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতেও মানব কৃষ্ণের কথা জানা যায়। অতএব কৃষ্ণ যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ মহাপুরুষ কালক্রমে দেবতা এবং পরমদেবতারূপে কল্পিত হইযাছেন। গৌতম বুদ্ধ, কপিল, গৌরাঙ্গ ও পরমহংসদেবের কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। স্যার আর, জি, ভাণ্ডারকর (২১) এবং ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (২২) কৃষ্ণের মানব সত্তায় বিশ্বাস করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নিজের মানবোচিত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তোমম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ (গীতা, ৯, ১১)

অর্থাৎ, যাহারা বিমূঢ়চেতা, তাহারা আমার এই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর ভাব জানিতে পারে না, এবং আমি এই মনুষ্যদেহ-ধারণপূর্ব্বক মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া আমাকে মনুষ্য বলিয়াই জানে। “মানুষীন্তনুমাশ্রিতং” শব্দকে শঙ্করাচার্য্য এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং

দেহমাশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ।" শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—"ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি।" মধুসূদন সরস্বতী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং মূর্ত্তিমাত্মেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ।"

ডাক্তার হেম রায়-চৌধুরী মনে করেন যে, দৈবকীপুত্র এবং ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বাসুদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক যে ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছিল তাহাই ভাগবত বা একান্তিক ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম মথুরা প্রদেশে প্রথমে প্রচারিত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করে। বাসুদেব বৃষ্ণি-(সাত্বত বা যাদব) বংশের একজন রাজপুত্র এবং তাঁহার গুরু ঘোর আঙ্গিরস একজন সূর্য্যোপাসক ছিলেন। কারণ ভাগবত-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যে স্বয়ং সূর্য্য, একথা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উল্লেখ করা হইযাছে,—

সাত্বতম্ বিধিমাস্থায়
প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্ (১২, ৩৩৫, ১৯)।

গীতাতেও স্বযং শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উক্তি করিযাছেন,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবাহনহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষা কবেহব্রবীৎ॥ (৪, ১)

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বলা হইযাছে যে, ভাগবত বা একান্তিক ধর্ম্মের সারমর্ম্ম স্বয়ং ভগবান গীতায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১২, ৩৪৬; ১১ ও ১২, ৩৪৮; ৮)। কালক্রমে দেবকীপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ বৈদিক-বিষ্ণুর সহিত এক হইযা গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাসুদেব-নারায়ণ বিষ্ণুকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন,—তৈত্তিরীয আরণ্যক হইতেই আমরা ইহার পরিচয় পাই (১০, ১, ৬)। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মনে করেন যে, খুব সম্ভবত অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ইহার জন্য দাযী। অশোকের প্রচার-কার্যের বিরুদ্ধে বৈদিক-মতাবলম্বীগণ নিজেদের দলপুষ্টির জন্য ভাগবত-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাকে মানিযা লইযাছিলেন (২৩)। নারায়ণী-মতবাদ বহু প্রাচীন ভক্তিমূলক মতবাদ। আদিতে ইহা বিষ্ণু উপাসক ও বাসুদেব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত হইতে পৃথক হইলেও, কালক্রমে ইহাদের সহিত একত্রিত হইয়া মহান ভক্তিধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপনা করিয়াছে। মহাভারতের যুগেই এই সংশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছিল (২৪)।

ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সাম্প্রদায়িক-দেবতা বিষ্ণু বৈদিক

বিষ্ণু হইতে পৃথক (২৫)। ব্রাহ্মণ্য-যুগেও বিষ্ণু এতখানি প্রাধান্য লাভ করেন নাই, যাহাতে তাঁহার কোন মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ বা পূজার প্রচলন হইয়াছিল (২৬)। সাত্বতকুলগৌরব বাসুদেব কৃষ্ণের সহিত যখন অভিন্নরূপে কল্পিত হইলেন, তখন হইতেই এই ভক্তিমূলক-ধর্ম্মমতবাদ "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" আখ্যা লাভ করিল এবং পরবর্ত্তীকালে এই নামেই তাহা বিখ্যাত হইল। ক্ষত্রিয়রাজ সাত্বত-বাসুদেবের প্রবর্ত্তিত মতবাদ যাঁহারা গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা পরে তাঁহার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ—যেমন, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে বাসুদেবেরই রূপান্তর বা তাঁহার অপেক্ষা নিম্ন স্তরের দেবতা হিসাকে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। এই একেশ্বর মতবাদ প্রথমে পাঞ্চরাত্র, ভাগবত বা একান্তিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইত। আদিতে বৈদিক ধর্ম্মমতাশ্রয়ীগণ এই মতবাদকে সমর্থন না করিলেও কালক্রমে বৈদিক বিষ্ণুর অবতাররূপে বাসুদেব গৃহীত হইলেন। ইহার অন্যতম কারণ হয়ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতাবলম্বীদের কার্য্যকলাপের প্রতিক্রিয়া। ইহার সহিত কালক্রমে নারায়ণ অভিন্ন হইয়া পড়িলে মহান্ ভক্তিধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতেই এই সংশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে (২৭)।

বৈদিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল তাহার ফলে আচার ও ক্রিয়াহীন বহু ধর্ম্মমত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্ম, বর্দ্ধমান মহাবীর-প্রবর্ত্তিত জৈন-ধর্ম্ম এবং মোকৃখলি গোসাল-প্রবর্ত্তিত আজীবক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ইহারই নিদর্শন। বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত ভাগবত ধর্ম্মও ইহাদের অন্যতম বলিয়া আমার মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবক মতবাদ হইতে ভাগবত ধর্ম্ম প্রাচীন এবং এই মতবাদের উপর অহিংসার প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত ভাগবত-ধর্ম্মের বিস্তার ও রূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। গুপ্তযুগে দেখা যায় যে সেই সময়ে ভাগবত-ধর্ম্ম বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং বিষ্ণু প্রধান দেবতা রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই যুগে যোগদর্শনের সহিত ভাগবত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। অবতারবাদও এই সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর কল্পনা করা হইয়াছে। পৃথিবীকে "বৈষ্ণবী" আখ্যা দান করিয়া বিষ্ণুর অপর স্ত্রী বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করা হইয়াছে।

উত্তরভারতে ভাগবত ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ হইলেও দাক্ষিণাত্যেই

ভাগবত ধর্ম্ম অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভাগবত ধর্ম্মের মূলকথা ভক্তি। দাক্ষিণাত্যে এই ভক্তিধর্ম্মের প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিযাই বোধ হয পদ্মপুরাণে ভক্তি বলিতেছেন—"আমার জন্ম দ্রাবিড়ে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, কিছুকাল স্থিতি মহারাষ্ট্রে এবং জীর্ণতা গুজরাটে (২৮)।" বিষ্ণুপুরাণেও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায ; কারণ সেখানে ভক্তির উপদেষ্টা কালিঙ্গ বা কলিঙ্গ-দেশীয (২৯)। ভাগবত-পুরাণে বলা হইযাছে, কলিযুগে অধিকাংশ স্থানেই নারাযণের ভক্ত সংখ্যা দুর্লভ, কিন্তু দ্রাবিড-দেশে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর (৩০)।

ভাগবত ধর্ম্ম দৈবকীপুত্র বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং ভক্তিকেই ভিত্তি করিযা এই ধর্ম্ম গডিযা উঠিযাছে। কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণ দেবপদবাচ্য হইযা চরম দেবতার আসন লাভ করিযাছেন এবং বিষ্ণু, নারাযণ, হরি ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্ম হইযা গিযাছেন। মূলে বেদোক্ত আচারাদির বিরুদ্ধবাদী হইলেও কালক্রমে বেদপন্থী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত ও অঙ্গীভূত হইযা যায এবং বেদগ্রাহ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত সংশ্লেষণ হইযা পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবধর্ম্মের আকার গ্রহণ করে।

ভাগবত ধর্ম্মে একমাত্র ভগবানের উপাসনা ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করা অনুচিত। ভগবানকে একমাত্র সার বস্তু ব'লিযা গ্রহণ করিযা শাস্ত্রীয় আচরণকে তাঁহারা গৌণ বলিযা মনে করেন, কেননা হরিই সমস্ত বেদ ব্যাপিযা আছেন, "সর্ব্ববেদময হরিঃ" (ভাঃ ৭,১১,৭)। আচার, বিধি, নিষেধ ও ব্যবহার প্রভৃতি যাহা শাস্ত্রেব নির্দ্দেশ আছে তাহাব উপর নির্ভর করিলে কোন ফল হইবে না, কারণ সেই সমস্ত বাহ্য। আপনার অন্তবে যাহা উপলব্ধি করা যাইবে তাহাই পবম সত্য। অন্তরের আলোকে যাহা উদ্ভাসিত হয, তাহার উপরেই নির্ভর করা উচিৎ—স্বযং শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিযাছেন। ভাগবত পুরাণ হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে ভগবানের আরাধনায সকলের সমান অধিকার আছে, কোন বিশেষ জাতি বা শ্রেণীর ভিতর ইহা আবদ্ধ থাকিতে পারে না। (৩১)

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম ভক্তিমার্গের একটি বিশিষ্ট রূপ। বহু যুগের ও বহু সাধকের সাধনার ফলে এই বিশেষ মতবাদের উদ্ভব হইযাছে। প্রাচীন যুগের ভাগবত ধর্ম্ম বা ঐকান্তিক ধর্ম্ম (পাঞ্চরাত্র বা সাত্বত) ও বিষ্ণুর উপাসনা এবং নারায়ণের উপাসনা মহাভারতের যুগেই সংশ্লেষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কৃষ্ণ-বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়া যে ভাগবতধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল

তাহার পরিচয় আমরা গীতাতে পাই। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস জানিবার কোন সূত্রই এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।—পৌরাণিক উপাখ্যান জনশ্রুতি ও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মে মিলিত হইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা সমাধান করিবার কোন উপায় নাই। ভক্তিবাদ সম্বন্ধে প্রণালীবদ্ধভাবে দার্শনিক যে সমস্ত মতবাদ রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে নারদের পাঞ্চরাত্র ও শাণ্ডীল্যের ভক্তিসূত্রই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ' ভক্তিবাদের যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের প্রভাবে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—ভক্ত ও ভগবানের এই দ্বৈতবাদ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই মনে হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রসার দেখিতে পাই,—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন চারিটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল কথা হইতেছে ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রে ভক্তিকে বলা হইয়াছে—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" (১,২,) অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে যে একান্ত অনুরাগ তাহাই ভক্তি, ভাষ্যকার সুরেশ্বর এই সূত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে (১,২০,৯) দেখা যায় যে পরম ভক্তিমান প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা বিষয়ের আলাপ করার দরুণ বিষয়ের প্রতি অচলা প্রীতি থাকে, আমি সর্ব্বদা তোমার (অর্থাৎ ভগবানের) কথাই স্মরণ করিতেছি। সুতরাং তোমার প্রতি যেন আমার অচলা প্রীতি থাকে। বিষ্ণু পুরাণের অন্যত্র ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি কামনা করায় সুরেশ্বর ভক্তি ও প্রীতি সমান অর্থক বলিয়া মনে করেন। সুখভোগ হেতু যে অচলা অনুরাগ তাহাই প্রীতি শব্দের অর্থ—প্রমাণস্বরূপ পাতঞ্জলের "সুখানুশয়ী রাগঃ" (২,৭) উদ্ধৃত করিয়া সুরেশ্বর দেখাইয়াছেন যে পাতঞ্জলও অনুরাগকে সুখানুগত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুরেশ্বরের ভাষ্য অনুসারে ভগবানের নাম কদাচিৎ স্মরণ ও কীর্ত্তন করাকে ভক্তি বলে না; আবার ঈশ্বর-জ্ঞানও ভক্তি নয়। কারণ ঈশ্বরের প্রতি যাহাদের দ্বেষ আছে তাহাদেরও ঈশ্বর জ্ঞান আছে। ভগবানকে আরাধ্য মনে করা যে জ্ঞান তাহাও ভক্তি নহে। কারণ পূজা প্রভৃতিও আরাধনা, কিন্তু তাহা ভক্তির পর্য্যায়ে পড়ে না। গীতাতে স্বয়ং ভগবান চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণের কথা বলিয়াছেন :

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
(গীতা—১০।৯।১০)

[(পণ্ডিতগণ) মচ্চিত্ত ও মদ্‌গত প্রাণ হইয়া পরস্পরে আমার তত্ত্ব আলাপ করিয়া এবং পরস্পরকে বুঝাইয়া দিয়া অধিকতর আনন্দিত এবং আমার প্রতি অনুরক্ত হইযা থাকেন। উক্ত প্রকার প্রীতি-সহকারে সতত আমাকে আরাধনা করিলে আমি (ঈশ্বর) তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করি, তদ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে পারে।]

তদ্গতপ্রাণ হইযা ভগবানের কথা আলোচনা করিলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্তি হইবে, নিষ্কাম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায। ভগবানে যে দৃঢ় অনুরাগ তাহাই ভক্তি এবং এই ভক্তিই মুক্তিরূপ প্রেয় সাধন করিতে পারে, জ্ঞান তাহা পারে না। জ্ঞান মার্গের সাধক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত মিশিযা যাওযাই তাঁহার একমাত্র কাম্য। যোগমার্গে যাহারা সাধনা করেন তাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ কামনা করেন। কিন্তু ভক্তি মার্গে যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহারা লীলাময ভগবানের প্রতি অনুরাগ বশত তাঁহার সেবা কামনা করেন। গীতাতে স্বযং ভগবান বলিযাছেন—"ভক্ত্যাহমেনযা গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১) ভগবান ভক্তির বশ, সেইজন্য ভক্তিমার্গে সাধনা করিলে তাঁহাকে যেরূপ উপলব্ধি করা যায়, জ্ঞান বা যোগমার্গে তাহা করা যায না। ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী এবং শুদ্ধা বা অহৈতুকী। শাস্ত্র-শাসনের উপরোধে যাঁহারা ভগবানের সাধনা বা ভজনা করেন তাঁহাদের ভক্তি বৈধী ভক্তি। এইরূপ সাধনাতে ভগবানের ও জীবের সেবক ও সেব্য ভাব সাধকের মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকে এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার জ্ঞানই প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ বৈধী অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবানের প্রতি শুদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তি জন্মিতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মমত এই অহৈতুকী ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরূপ গোস্বামী সংগৃহীত পদ্যাবলীর (ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় সং) ৯৫ সংখ্যক শ্লোক মহাপ্রভু-রচিত বলিযা শ্রীরূপ গোস্বামী উল্লেখ করিযাছেন। সেই শ্লোক হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু জন্মজন্মান্তরে কেবলমাত্র শুদ্ধা ভক্তি কামনা করিয়াছিলেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

ভারতীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চারিটি মতবাদে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই চারিটি সম্প্রদায় শ্রী, মাধ্ব, রুদ্র ও চতুঃসন বা সনক সম্প্রদায় নামে খ্যাত। দক্ষিণ-ভারতের আলবারগণ মানবহৃদয়ের ভক্তিবাদ লইয়া ভক্তির নূতন ধারার সন্ধান পাইলেন। ভক্ত আলবারগণ যে ভক্তির রসসিঞ্চিত বাণী প্রচার করিতেছিলেন যমুনাচার্য্য তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা পূরণ করিয়া প্রণালীবদ্ধ করিলেন। আলবারগণের বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রামানুজ আচার্য্য দ্বাদশ শতকে যে বৈষ্ণব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহাই শ্রীসম্প্রদায় নামে খ্যাত। লক্ষ্মীর উপদিষ্ট বলিয়া রামানুজ-প্রবর্ত্তিত মতকে শ্রীসম্প্রদায় বলা হয়। রামানুজ যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে বেদান্তের প্রভাব থাকায় তাঁহার মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও বলা হয়। রামানুজাচার্য্য প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায় লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক এবং তাঁহাদের কাম্য বা পুরুষার্থ বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি। (৩২)

চতুর্দ্দশ শতকে আনন্দতীর্থ দ্বৈত-মতাশ্রয়ী মাধ্বমত প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ও বলা হয়। এই সম্প্রদায় ভেদবাদী এবং ইঁহাদের কাম্য বা পুরুষার্থ বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি। শ্রীসম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদের কাম্য বৈকুণ্ঠ লাভ হইলেও বৈদান্তিক মতের পার্থক্যের জন্য ইহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মাধ্বমতবাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদের আপাত সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। মাধ্বমতে রাস পঞ্চাধ্যায় অচল, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তাহা প্রাণস্বরূপ ছিল। দ্বিতীয়ত, মাধ্ব মতানুযায়ী কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই সাধনায় অধিকার আছে; কিন্তু মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে আচণ্ডাল সকলেরই সমান অধিকার। তৃতীয়ত, মাধ্বমতে ভক্তির সহিত আচরণ থাকা চাই, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুযায়ী শুদ্ধা ভক্তিই যথেষ্ট (৩৩)।

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে বিষ্ণুস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার অনুসরণকারীগণ রুদ্র সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। তাঁহার পুত্র বল্লভাচার্য্য বিখ্যাত পুষ্টিমার্গ মতবাদ স্থাপন করেন (৩৪)।

নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক যে মতবাদ স্থাপন করেন, তাহা চতুঃসন বা সনক

সম্প্রদায় নামে খ্যাত। নিম্বার্কের প্রচারিত মতবাদকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের এই চারি সম্প্রদায় পৃথক পৃথক বৈদান্তিক মতবাদ পোষণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ ইহাদের হইতে পৃথক বৈদান্তিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত (৩৫)।

শঙ্করাচার্যের মতানুসারে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। আচার্য্য রামানুজ ও নিম্বার্ক উভয়েই ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জীব এবং জগতও যে ব্রহ্মের মত সত্য—তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত মতবাদের সহিত আচার্য্য রামানুজ ও নিম্বার্কের মতবাদের মূলগত পার্থক্য আছে। কিন্তু শেষোক্ত দুইজনের মতে মূলগত কোনো পার্থক্য নাই। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ প্রভৃতি সম্পর্কেও সাধারণ-ভাবে কোনো পার্থক্য নাই। রামানুজের মতে বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম আর নিম্বার্কের মতে কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্য বলেন ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগৎ অভিন্ন। রামানুজের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে স্বরূপত অভিন্ন হইলেও ধর্ম্মত এক। কিন্তু নিম্বার্কের মতানুসারে জীব ব্রহ্ম হইতে স্বরূপত এবং ধর্ম্মত পৃথক (৩৬)। শঙ্করাচার্য্য হইতে নিম্বার্ক পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে ধারা, তাহা হইল বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ হইতে ভক্তিবাদে পরিবর্ত্তনের ধারা।

ভাগবত পুরাণে যে গোপীভাব-প্রধান সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা শ্রীসম্প্রদায় ও মাধ্বসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী প্রবর্ত্তিত মতবাদে ইহার আংশিক সমাদর হইয়াছে সত্য, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদে যে মধুর ভাবের সাধনার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না (৩৭)।

ডঃ সুশীলকুমার দে মনে করেন যে, শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকা ও বাংলায় প্রচলিত বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও আচার এবং মহাযান ও সহজযান বৌদ্ধধর্ম্ম মতের শেষ অবস্থায় বাংলা দেশে যে সকল আচার ও ব্যবহারের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মমতের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার সহিত বামাচারী তন্ত্রমত এবং মিষ্টিক সহজিয়া ও নাথ ধর্ম্মের প্রভাবও লক্ষিত হয়। যদিও মুক্তপুরুষ মহাপ্রভু এই সমস্ত আচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তবুও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সকল ধর্ম্মমত ও আচার ব্যবহারের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে

প্রভাবান্বিত হইয়াছে (৩৮)। সুফী ধর্ম্মের প্রভাবও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। এবিষয়ে পরিশিষ্টে (খ) বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

(১) Materials for the Study of the Early History of the Vaisnava Sect—H C. Roychaudhuri, M. A., Ph. D. (2nd Edn.) ; p. 11.

(২) Do—p. 14.

(৩) Do—p. 15-16.

(৪) Do—p. 16-17

(৫) Do—p. 18.

(৬) Early Visnuism and Narayaniya Worship—Sreemati Mrinal Das Gupta (I. H. Q. Vol. VII, 1931 ; p. 97 f. n.)

(৭) Indian Literature—Winternitz ; p. 465.

(৮) Materials etc.—Dr. H. C. Roychaudhuri ; p. 18.

(৯) Hindu Iconography—Dr. J. N. Banerjee (J. I. S. O. A., Vol. XIII, 1945 ; 56—57).

(১০) Materials etc—Dr. Roychaudhuri ; p. 20—23.

(১১) Do ; page. 30.

(১২) Introduction to Taittiriya Aranyaka—Dr. R. L. Mitter ; p. 8.

(১৩) Indian Antiquiry 1912, p. 13.

(১৪) J. R. A. S. 1915 ; p. 840.

(১৫) Early History of Vaianava Sect—Roychaudhuri—p. 36.

(১৬) Mc Crindle—Ancient India as Described by Magasthenes and Arrian p. 201.

(১৭) Do p. 140n. ; Indian Ant. (1876) p. 334 ; Hopkins—The Religion of India p. 450.

(১৮) Macdonell—History of Sanskrit Liteature p. 226.

(১৯) R.L. Mitter—Introduction of Chandogya Upanishada—p. 23-24.

(২০) Do Do.

(২১) Ind. Ant. (1889) p. 189.

(২২) Comparative Studies in Christianity 'and Vaisnavism by Dr. Brojendra Nath Seal p. 10.

(২৩) Early History of the Vaisnava Sect—Roychaudhuri—P 106.

(২৪) Eariy Vishnuism and Narayaniya Worship—Srimati M. Dasgupta —I. H. Q (Vol. VII, 1931) p. 351.

(২৫) Hindu Iconography—Dr. J. N. Banerjee—J. I. S, O. A. (Vol. XIII, 1945, p. 58).

(২৬) Do Do P. 59.

(২৭) Do Do. P. 59-61.

(২৮) পদ্ম পুরাণ ; উত্তর খণ্ড ৫০-৫১

(২৯) বিষ্ণু পুরাণ, ৭ম অধ্যায, ৩

(৩০) ভাগবত পুরাণ, ১১, ৫, ৩৮

(৩১) ভারতীয সংস্কৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন, ৪৪-৪৫ পৃঃ

(৩২) শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, ৬৯ পৃঃ

(৩৩) বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন, ৫৫ পৃঃ

(৩৪) ভারতীয মধ্যযুগের সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন, ৩৪ পৃঃ

(৩৫) শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, ৬৯ পৃঃ

(৩৬) বেদান্ত দর্শন—রমা চৌধুরী

(৩৭) বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম—মহামহোপাধ্যায পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

(৩৮) Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal by Dr. S. K. De. P. 20-21.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বাংলায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ কি ছিল তাহা বলা শক্ত। গুপ্তযুগে বিষ্ণুপ্রধান যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রসার লাভ করিয়াছিল আমার মনে হয়, বাংলা দেশেও সেই মতবাদ প্রচলিত ছিল। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর শুশুনিয়া পর্ব্বতলিপিতে চন্দ্রবর্ম্মণকে চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক বলা হইয়াছে। আনুমানিক একাদশ শতকের বেলাব শিলালেখে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীশতকেলিকার" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শিলালেখ অনুসারে কৃষ্ণ অংশাবতার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সমস্ত পৌরাণিক আখ্যান প্রচলিত আছে সেই সমস্ত আখ্যান ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী হইতে বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। পাহাড়পুরের যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পাওয়া গিযাছে তাহা হইতে আমরা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। পাহাড়পুরে যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ, কেশীবধ, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বাললীলার প্রতিরূপ আমরা পাইতেছি। পাহাড়পুরে একটি যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ডঃ সুশীলকুমার দে প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই যুগলমূর্ত্তিকে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বলিয়া সন্দেহ করেন। (১) কিন্তু ডঃ প্রবোধকুমার বাগচী এই যুগলমূর্ত্তির স্ত্রী মূর্ত্তিটি হয় সত্যভামা বা রুক্মিনা বলিযা অনুমান করেন। (২) এই যুগলমূর্ত্তি হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না যে ইহা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি অথবা কৃষ্ণ ও সত্যভামা বা রুক্মিণীর যুগলমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি মন্দিরের শোভাবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পূজার জন্য নহে। উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে মিথুনমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহারাও শুধুমাত্র অলংকরণের উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ হইযাছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত যুগলমূর্ত্তি উড়িষ্যার মিথুনমূর্ত্তির অনুকরণে রচিত বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

পাল-পর্ব্বে পাল, চন্দ্র ও কাম্বোজ রাজবংশ প্রত্যেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সেনপর্বে সেন, বর্মণ ও দেবরাজবংশ প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী ছিলেন এবং এই পর্ব্বে বাংলার সর্বব্যাপী ধর্ম্ম ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এবং সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বেদ, পুরাণ, স্মৃতি দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তন্ত্রদ্বারা স্পৃষ্ট (৩)।

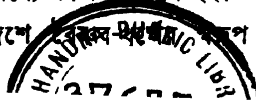
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বর্ম্মণ বংশের রাজারা সকলেই পরম বিষ্ণুভক্ত। লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব ও পরম নারসিংহ। ভোজ বর্ম্মার বেলাব ও লক্ষ্মণ সেনের তর্পণ-দীঘি-শাসনে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কথা দেখা যায়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং বিষ্ণুর কৃষ্ণ, নারসিংহ এবং পরশুরাম অবতারের কথাও আছে। (৪) ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগ্মরূপের কল্পনা দক্ষিণ ভারতেই বেশী প্রচলন ছিল এবং তিনি অনুমান করেন যে সেন-পর্ব্বে দক্ষিণ দেশ হইতেই এই পূজার রূপ ও কল্পনা বাংলা দেশে প্রবর্ত্তিত হইযাছিল। (৫) কবি ধোযীলিখিত পবন-দূতের একটি শ্লোক হইতে অনুমান করা যায যে সেন রাজাদের কুলদেবতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ এবং বাররামাদের নৃত্যগীত সহযোগে তাঁহাদের অর্চ্চনা করা হইত। ডঃ নীহাররঞ্জন রায মনে করেন, সেন-পর্ব্বে বাংলা দেশ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসে দুইভাবে পুষ্ট হইযাছে—একটি বিষ্ণুর দশাবতার সমন্বিত রীতিবদ্ধরূপ অপরটি রাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও রূপ কল্পনা। (৬)

রাধা ও কৃষ্ণের যে রূপ কল্পিত হইযাছিল তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত রূপ আমরা খুব সম্ভবত কবি জযদেবের গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই। হাল-সপ্তশতীতে রাধার উল্লেখ আছে। কিন্তু গীতগোবিন্দে যে স্পষ্ট রূপের পরিচয পাওযা যায়, সপ্তশতীতে তাহা পাওয়া যায় না। ভাসের বালচরিতে, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত ভোজবর্ম্মার বেলাব লিপিতে শত গোপিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলার কথা আছে, কিন্তু সেখানেও রাধার কোন উল্লেখ নাই। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে শাক্তধর্ম্মের প্রভাব বশত সেন পর্ব্বের কোনও সমযে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হিসাবে রাধা কল্পিত হইয়াছিলেন। (৭) উজ্জ্বল নীলমণিতে শ্রীরূপ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ডঃ রায়ের অনুমান সমর্থিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥
হ্লাদিনী যা মহাশক্তি সর্ব্ব শক্তি বরীয়সী।
তৎসার ভাব রূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্টিতা॥

(উ. নী. রাধা প্রকরণ ৩, ৪)

সর্ব্বসাধারণের ধারণা যে কবি জয়দেব পরমবৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। (৮) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি ভাগবত-পুরাণ, কিন্তু জয়দেব ভাগবত-পুরাণ অনুসরণ করেন নাই। ভাগবত-পুরাণে শারদীয়-রাসের বর্ণনা আছে, কিন্তু জয়দেব বসন্তকালীন রাসলীলা গাহিয়াছেন। গীতগোবিন্দে আমরা দেখিতে পাই যে নন্দের নির্দেশ ক্রমে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের মিলন হয়। ইহা তো ভাগবত পুরাণের অনুরূপ নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের অনুরূপ। বৈষ্ণব-মহাজন বলিতে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধকের ধারণা করি জয়দেব তাহা ছিলেন না। জয়দেবের পরবর্ত্তীকালে মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি তাঁহার রাগাত্মিক পদগুলি রচনা করেন। তাঁহার পদগুলিতে গীতগোবিন্দের ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবমহাজনপদ সকল যে বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বয়ং চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ শুনিয়া আনন্দ পাইতেন তাহা আমরা চৈতন্য চরিতামৃত হইতে জানিতে পারি। আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে বৈষ্ণবমহাজন বলিতে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক মনে করি বিদ্যাপতি তাহা ছিলেন না, তিনি মিথিলা, বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের মতন স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য্য, শিব বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন। (৯) শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর পথিকৃৎ হিসাবে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু চৈতন্যোত্তর পদকর্ত্তাদের পদে বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম ও হৃদয়াবেগের যে পরিচয় পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তাহা পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে প্রেম তাহা কামগন্ধ বর্জ্জিত নহে, তাহা প্রাকৃত নায়ক ও নায়িকার প্রেম কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ তাঁহার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা রাধিকাকে বারম্বার প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন—"পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি"র কোন পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রাক্-চৈতন্য যুগের অপর গ্রন্থ মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় মনে করেন যে উত্তর ভারতীয়-ভাষা-সাহিত্যে যে সকল কৃষ্ণ চরিত্র লেখা হইয়াছে তন্মধ্যে কাল হিসাবে ইহা প্রথম ও প্রাচীন। (১০) প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলা দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ কি ছিল তাহা



শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় হইতে আমরা জানিতে পারি। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান ধারা ছিল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি এবং ভগবত্তা—শ্রীকৃষ্ণ যে পরতত্ত্ব তাহা মালাধর বসু তাঁহার গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে বৃন্দাবনলীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার লীলার ধারা অতি ক্ষীণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থে উক্ত লীলার আভাষ মাত্র আছে—গোপীগণের উল্লেখ থাকিলেও শ্রীমতীর উল্লেখ নাই। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব লেখকগণের রচনায় শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে সেইরূপ আত্ম-সমর্পণের কোন আভাষ পাওয়া যায় না—অবশ্য একটি মাত্র পংক্তি আছে "বাসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণ পতি" (পৃঃ ১—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত।)

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় মনে করেন যে গোপীভাব-প্রধান বৈষ্ণব-সাধনা রামানুজ-সম্প্রদায় এবং মাধ্ব সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই নিম্বার্ক ও বিষ্ণু স্বামী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে উক্ত সাধনা চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। মধুর রসের অনুকূল কোনপ্রকার সাধনা যে চৈতন্যপূর্ব্ব বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তর্কভূষণ মহাশয় মনে করেন যে 'রাধাতন্ত্র', 'বিষ্ণু যামল' প্রভৃতি তন্ত্রে এই রূপ মধুর ভাবের সাধনার কথা আলোচিত হইলেও সেই প্রকার সাধনার কোন সুশৃঙ্খল প্রণালী প্রাক্‌চৈতন্য বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (১১)

জয়দেবের সমসাময়িক ধোয়ী, উমাপতি ধর প্রভৃতি অনেকেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীর্তন করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যের বৈষ্ণব-সাধন প্রণালী বা ভাবসম্পদের পরিচয় তাঁহাদের রচনায় পাওয়া যায় না। ধোয়ী, জয়দেব, উমাপতি ধর, শ্রীধর প্রভৃতি কবিগণ লক্ষ্মণ সেনের স্তুতিচ্ছলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন—কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, তিনি 'গোপবধূবীট'। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন সেই সময়কার অভিজাত-সমাজের চটুল চিত্র আমরা এই সমস্ত কবিদের কাব্য হইতে পাইতেছি। অভিজাত সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য অভিজাত সমাজকর্ত্তৃক প্রতিপালিত কবিগণ সাহিত্যে শৃঙ্গাররস ও ভাবতারল্যের প্রাবল্য আনিয়াছেন। কাব্য সাহিত্য এই যুগ মন্মথ ভট্টের রসতত্ত্বের যুগ—রসই এই যুগে কাব্যের প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। 'তাঁহার মতে গীতগোবিন্দে

ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কামবাসনাময় আবহাওয়ার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে আশ্রয় করিয়া একই সঙ্গে ইন্দ্রিয় কামনা ও প্রেমাভক্তির জয় ঘোষণার ইঙ্গিত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। (১২) অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও অনুরূপ ধারার প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বহু বিষ্ণু-প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে; পাল-চন্দ্র-কাম্বোজ পর্ব্বের প্রতিমাদের মধ্যে বৈষ্ণব-পরিবারের সংখ্যাই বেশী। সাধারণত বিষ্ণুর উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, নিম্নে বাহন গরুড়। আসন, শয়ান ও স্থানক বিষ্ণুর মধ্যে এই পর্ব্বে স্থানক বিষ্ণুর আধিক্য দেখা যায়। (১৩) পূর্ব্বোল্লিখিত পাহাড়পুরের যুগল মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য যুগল মূর্ত্তি এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।

বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটি ধারা প্রাক্-চৈতন্য যুগে প্রবাহিত ছিল। অভিজাত গোষ্ঠীর চটুলতা ও ইন্দ্রিয় বিলাসের আবহাওয়া ছাপাইয়া তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেম ধর্ম্মের তাহাই অগ্রদূত বলিয়া আমরা মনে করি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেম রসের আদি প্রচারক বলা হইয়াছে,

ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার॥

(চৈ. ভা. আদি, ৬ পৃঃ)

শেখরের পদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের জন্মাইবার পূর্ব্বেই ব্রজরস গাহিয়াছেন।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাঞা বাপু শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ॥

(গৌ. প. ত, ৩০২ পৃঃ)

আমরা আরও জানিতে পারি যে শ্রীধর স্বামী ও মাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া ক্ষুদ্র একটি বৈষ্ণব-সমাজ নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিল এবং অদ্বৈতাচার্য্য ইহাদের মুকুটমণিস্বরূপ ছিলেন। শ্রীধর স্বামী ও মাধবেন্দ্রপুরীর

ভাবধারার অনুসরণ করিয়া খুব সম্ভবত অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার প্রথম জীবনে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন বলিয়া ডঃ সুশীলকুমার দে অনুমান করেন। (১৪) বৈদান্তিক হইয়াও অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তি-ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন এবং শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর'আগমনের সূচনা করেন ও অবশেষে মহাপ্রভুকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করেন।

চতুর্দ্দশ শতকে গৌড় বা বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। চতুর্দ্দশ শতক হইতেই দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়িয়া ওঠে এবং দিল্লীর সুলতানগণের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে। সুলতান মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পূর্ব্বেই ১৩৩৯ খ্রীঃ অব্দে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিহত হন এবং মালিক ফকরুদ্দিন নামে তাঁহার একজন সেনানায়ক নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু দিল্লীর শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইলেও গৌড়ের সুলতানগণ নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। গৌড়ের হিন্দু জমিদারগণ তখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন ও হিন্দু রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা গণেশের পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং রাজা গণেশের পৌত্রকে ওমরাহগণ হত্যা করিয়া ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপনা করেন। কিন্তু এই ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ যে অরাজকতা ও অত্যাচার আরম্ভ করেন তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু সামাজপগিণ ও মুসলমান ওমরাহগণ একত্র হইয়া আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে নবাব নির্ব্বাচন করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজ্য উড়িষ্যার সহিত গৌড়ের বিবাদ চলিতে.ছল। গৌড়ের এই অরাজকতার সুযোগ লইয়া স্বার্থপ্রণোদিত ক্ষমতাশালী সম্প্রদায় নির্য্যাতনের সুবিধা পাইতেন এবং সে সুযোগ গ্রহণ করিতেন। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য মঙ্গলে এইরূপ অত্যাচারের কাহিনী বিশদ ভাবে বর্ণনা করিযাছেন। নবদ্বীপ শেষ হিন্দু রাজার রাজধানী ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র থাকাতেই বোধ হয় সেইখানে অত্যাচারের মাত্রা অধিক হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নষ্ট হইবার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে মধ্যযুগে সমস্ত চিন্তাধারার শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষে ভক্তিমূলক ধর্ম্মমতবাদ প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানে অধিকতর

আস্থাবান ছিলেন এবং দ্রাবিড় জাতি ভক্তিধর্ম্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন, —ক্রমে আর্য্য-জ্ঞানের সহিত দ্রাবিড়-ভক্তির সংশ্লেষণ হইয়া ধর্ম্মের নূতন আদর্শ ও নূতন পরিকল্পনার উদ্ভব হইল। মুসলমান ধর্ম্মের সংঘাতে এই ধর্ম্ম নূতন উদ্দীপনা লাভ করিল। মুসলমানগণ তাঁহাদের সঙ্গে দৃঢ় নিষ্ঠা শুদ্ধ একেশ্বরবাদ ও কঠোর সাধনা লইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহিত এই ভক্তি ধর্ম্মের মিলনে মধ্যযুগে ভারতের ধর্ম্মমতের নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইল। এই উভয় ধর্ম্মের মিলনে মধ্যযুগে নবভক্তি, সাধনা ও অধ্যাত্ম দৃষ্টির পরিচয় আমরা পাই। (১৫) মুসলমান স্থফী সাধকদের সাধনা হইতে মধ্যযুগের সাধকগণ যে বহু প্রেরণা পাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। (১৬) মুসলমানগণ তাঁহাদের সাধনা এদেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন এবং এই দেশীয় সাধকগণও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। এই সংঘাতের ফলেই মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ভক্তিধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে। রামানন্দ হইতে এই নবযুগের আরম্ভ বলা যায়, কারণ তিনি দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তর ভারতে ভক্তি লইয়া আসেন। সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না লইয়া তিনি জাতি নির্ব্বিশেষে ভক্তির উপদেশ দিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে তন্ত্রের অবদানও কম নহে। সামাজিক অর্থহীন বন্ধনগুলি ঘুচাইয়া দিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে সমস্ত নরনারীকে সমান অধিকার তন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে এবং ধর্ম্ম সাধনার নূতন আদর্শ সকলের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাংলায় তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির যুগ; সহজিয়া ও বিকৃত তন্ত্র সাধনায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ ও অনুষ্ঠানের ভিতর লয় পাইয়াছে। তৎকালীন বাংলাদেশের ধর্ম্মমতের চিত্র বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য ভাগবতে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধনে॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহো—নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥
(চৈ. ভা. আঃ ২য় অঃ)

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাংলায় আমরা দেখিতে পাই যে রঘুনন্দন তাঁহার "অষ্টবিংশতি তত্ত্ব" লিখিয়া সমাজবন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া দিতেছেন; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ন্যায় তান্ত্রিক সাধক তন্ত্রসারের ন্যায় ক্রিয়াবহুল তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; আবার এই সময়ে পূর্ণানন্দ ব্যক্তিগত সাধনার জন্য "ষট্‌চক্রনিরূপণ" ও যোগ প্রভৃতি প্রচার করিলেন।

শঙ্করাচার্য্য হইতে নিম্বার্ক পর্য্যন্ত যে ধারা তাহা জ্ঞানবাদ হইতে ভক্তি-বাদের ক্রমবিকাশের ধারা। কিন্তু নিম্বার্ক যে ভক্তিবাদ প্রচার করিলেন তাহা আবেগ ও প্রেম-প্রধান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম আবেগের ও প্রেমের শীর্ষস্থান স্বরূপ। পঞ্চম পুরুষার্থ রূপ ভক্তিময় যে ধর্ম্ম চৈতন্যদেব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য-গণের ন্যায় তিনি স্বকীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশক কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। (১৭) চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে যে বিশেষ সিদ্ধান্ত তাহা জানিতে হইলে মহাপ্রভুর জীবনী অনুশীলন করা প্রয়োজন। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে তাঁহার মতবাদ আমরা বুঝিতে পারিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রমাণ পঞ্জী

(১) Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal by Dr. S. K. De, p. 7.
(২) (ক) History of Bengal Vol I (D. U. P.) p. 401
(খ) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব্ব)—ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ৬০১ পৃঃ
(৩) ঐ ৬৫৫ পৃঃ
(৪) ঐ ৬৫৯ পৃঃ
(৫) ঐ ৬৬০ পৃঃ
(৬) ঐ ৬৬১ পৃঃ
(৭) ঐ ৬৬২ পৃঃ
(৮) ঐ ৬৭৪ পৃঃ
(৯) মহাকবি বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতা—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত—ভূমিকা ১৶০—১৷০ পৃঃ

(১০) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ সম্পাদিত (ক. বি.) ভূমিকা

(১১) বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম (অধরচন্দ্র মুখার্জী বক্তৃতা)—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ৪৭-৪৮ পৃঃ

(১২) বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব্ব)—ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ৭৫২-৭৫৩ পৃঃ

(১৩) ঐ ৬১৭ পৃঃ

(১৪) Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal—Dr. S. K. De. p. 23. p. 25.

(১৫) ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন

(১৬) (ক) ঐ

(খ) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব্ব) ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

(১৭) বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম (অধরচন্দ্র মুখার্জী বক্তৃতা)—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ৫৪ পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায়

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার (ইং ১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপ আসেন এবং নীলাম্বর আচার্য্যের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপেই বাস করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ লইয়া বৈষ্ণব সমাজেই নানা মত দেখা যায়। বৃন্দাবনদাস মৎস্য, কূর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবতারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই অবতারের ধারায় বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের অবতার রূপে, শ্রীচৈতন্যকে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সর্ব্ব-অবতার হইলেও বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং যুগধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন প্রচার করিতে তাঁহার আবির্ভাব; ইহা ছাড়া পাষণ্ডী-দলন করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য—সেই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বৃন্দাবনদাসের পক্ষে এরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞায় বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; সুতরাং বৃন্দাবনদাস যাহা লিখিয়াছেন তাহা শ্রীনিত্যানন্দের অনুমোদিত। নরহরি-প্রবর্ত্তিত 'নদীয়া নাগর' ভাবের কথা বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সমর্থন করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের যে রাধাভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বৃন্দাবনদাস তাহাও করেন নাই।

বৃন্দাবনদাসের অনুগামী হইয়া জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং কীর্ত্তন প্রচার ও আচণ্ডালের উদ্ধার অবতারের আবির্ভাবের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গদাধর পণ্ডিতের নির্দ্দেশ অনুসারে জয়ানন্দ চৈতন্য-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন সুতরাং জয়ানন্দ যাহা লিখিয়াছেন তাহা গদাধর পণ্ডিতের অনুমোদিত বলিয়া মনে করা যায়।

লোচনদাস 'যুগাবতার' কথায় আপত্তি করিয়া শ্রীচৈতন্যকে 'পূর্ণ অবতারই' বলিয়াছেন, 'অংশ-অবতার' বলেন নাই। যুগধর্ম্মে সংকীর্ত্তন প্রচার করাই আবির্ভাবের কারণ বলিয়া লোচনদাস উল্লেখ করিয়াছেন।

হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রকট করিব (চৈ. ম. সূত্র খণ্ড)

পূর্ণ অবতারের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলে আমরা দেখিতে পাই—

রাধার বরণে অঙ্গ গৌরাঙ্গ হইয়া
রাধিকার ভাবরস অন্তরে ধরিয়া ॥ (চৈ. ম, আদি খণ্ড)

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের এই রাধাভাব প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ, লোচনদাস নরহরি সরকারের শিষ্য এবং নরহরির আদেশে তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছেন। নরহরি সরকার 'নদীয়া-নাগর' ভজন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক এবং গৌরাঙ্গদেব যদি স্বয়ং নাগর হন তবে তিনি রাধিকার ভাব অবলম্বন করিবেন কেন?

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন শ্রীচৈতন্য পূর্ণ ভগবান, কিন্তু যুগধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। পূর্ণ ভগবানের সহিত যুগাবতারের সামঞ্জস্য করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকালে দৈববশে যুগধর্ম্মের কাল উপস্থিত হয়। সেইজন্য যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তবুও যোগাযোগ হওয়ায় দুই উদ্দেশ্যই সাধিত হইল। সুতরাং যুগাবতারের আবির্ভাবের গৌণ উদ্দেশ্য হইল এই—

কোন কারণে হৈল যবে অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সেকালে মিলন ॥
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনি আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ (চৈ. চ, আঃ ৪র্থ পর্ব্ব)

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঞি ॥

(চৈ. চঃ আদি, ৪র্থ পর্ব্ব)

অর্থাৎ চৈতন্যদেব শুধু কৃষ্ণ নন; এক দেহে রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ। রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা এবং এক পরমার্থ তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং পূর্ণ ভগবান।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের আধিক্য দেখা যায়। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে তিনি নিষেধ করিয়া বলেন

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥ (চৈ. চ, মধ্য ৮ম)

শ্রীচৈতন্যের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিযাছেন :—

প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার ॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু আছে শুন অন্তরঙ্গ ॥ (চৈ. চ, আদি, ৪র্থ)

সেই 'হেতু' কি? শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের 'বিষয' ও শ্রীরাধিকা প্রেমের 'আশ্রয'। 'আশ্রয' এর প্রেম আস্বাদন অনেক বেশী। সেইজন্য 'আশ্রয' যে প্রেম উপভোগ করেন তাহার অভিলাষী হইযা এবং শ্রীকৃষ্ণের যে অদ্ভুত ও অনন্ত মাধুর্য্য একমাত্র শ্রীরাধিকা আস্বাদন করিতে পারেন, নিজের সেই মাধুর্য্যরস আস্বাদনের অভিলাষ করিযাই পূর্ণ ভগবান অবতাব রূপে আবির্ভূত হন।

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম-আশ্রয।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয ॥
বিষয জাতীয সুখ আমার আহ্লাদ।
আমা-হৈতে কোটি গুণ আশ্রযের আহ্লাদ ॥
আশ্রয জাতীয সুখ পাইতে মন ধায।
যত্নে আস্বাদিতে নাবি কি করি উপায ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইযে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয ॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধক্ধকী
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নবনব হয়।
স্ব স্ব প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥
... ...
আমা হৈতে রাধা পায যে জাতীয সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
... ...
রাধাভাব অঙ্গীকার,—ধরি তার বর্ণ
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ (চৈ. চ, আদি—৪র্থ)

শ্রীচৈতন্যের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা বলিয়াছেন তাহা মুখ্যত স্বরূপ দামোদবের কড়চার দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যা। সেই শ্লোক দুইটি যথাক্রমে—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেশস্থানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বযং চৈক্যমাপ্তং,
রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥ চৈ. চ, আদি, ১ম, ৫

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয মহিমা কীদৃশো বানযৈবা,—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যং সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ চৈ. চ, আদি, ১ম, ৬

শ্রীচৈতন্যের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিযাছেন তাহা বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের অনুমোদিত এবং এই ব্যাখ্যাই সাধারণ ভাবে বৈষ্ণব সমাজে গ্রাহ্য ও প্রচলিত। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মের নির্য্যাস ইহারই ভিতরে নিবদ্ধ রহিযাছে।

শ্রীচৈতন্য অংশাবতার না পূর্ণবতার তাহা লইযা বিতর্ক করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে একটি তথ্য আমরা পাইতেছি যে, নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকেই উপাস্য বলিয়া মনে করিতেন আর বৃন্দাবনের গোস্বামী-গণ তাঁহাকে আলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিযা রসশেখর রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপসনা করিতেন।

শ্রীচৈতন্য বাল্যলীলায আদরের নিমাই। শচীদেবী ৮টি কন্যা হারাইয়া বিশ্বরূপকে কোলে পাইযাছিলেন এবং বিশ্বরূপের ১০ বছর বয়সে নিমাইএর

জন্ম হয়, সুতরাং তিনি অত্যন্ত আদুরে হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বৃন্দাবনদাস অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং চৈতন্যদেবের বাল্যলীলায় কৃষ্ণলীলা সবিস্তারে আরোপ করিয়াছেন। সমস্ত চরিত লেখকগণই এ বিষয়ে একমত যে, বাল্যকালে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন, কিন্তু অতিশয় চতুরও ছিলেন। ১৪৯১ খ্রীঃ অব্দে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, জগন্নাথ ও শচীদেবী তাঁহার শোকে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বালক নিমাই যথাসাধ্য পিতামাতাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জগন্নাথ মিশ্র নিমাই-এর অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দিলেন; তাঁহার ভয় হইল লেখা পড়া করিলে নিমাইও সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। বালক নিমাই অশুচি স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং শচীমাতা তিরস্কার করিলে জবাব দিলেন—

তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে॥
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার হয়—অদ্বিতীয় জ্ঞান। (চৈ. ভাঃ, আদি, ৬ অঃ)

বালক নিমাইএর এই জবাব হইতে আমরা তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ও চতুরতার পরিচয় পাই। চৈতন্যভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি গঙ্গাদাসের টোলে পড়িতেন এবং অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। জয়ানন্দ বলেন, নিমাই আগে সুদর্শনের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরে গঙ্গাদাসের কাছে পড়িতে যান। নিমাই কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিতেন জয়ানন্দ তাহার একটি তালিকাও দিয়াছেন:

চন্দ্র-সারস্বত নব কাব্য নাটকে।
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে॥ (চৈ. ম, নদীয়া মঙ্গল)

১৪৯৬ খ্রীঃ অব্দে জগন্নাথ মিশ্র দেহ ত্যাগ করেন। নিমাই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং মাত্র ১৬ বছর বয়সে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বড় চণ্ডীমণ্ডপে নিজে টোল খুলিয়া অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি হইল এবং বহু ছাত্র তাঁহার কাছে বিদ্যা লাভের জন্য আসিল। ১৫০১ খ্রীঃ অব্দে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী উভয়েই বিবাহে পূর্ব্বরাগের অবতারণা করিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবত অনুসারে এই সময় মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর

পুরী নবদ্বীপে আসেন এবং গুরুভাই অদ্বৈতের বাড়ীতে অবস্থান করেন। ঈশ্বর পুরীর সহিত অধ্যাপক নিমাই অনেকবার সাক্ষাৎ করেন এবং ব্যাকরণের কোন তর্কে ঈশ্বর পুরীর নিকট পরাস্ত হন। বৃন্দাবন দাস ব্যতীত ঈশ্বর পুরীর বৃত্তান্ত আর কেহই বলেন নাই। ঈশ্বর পুরীর সহিত অধ্যাপক নিমাইয়ের যে বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহারই ফলে হয়ত পরবর্ত্তী-কালে শ্রীচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি। চৈতন্যভাগবত অনুসারে এই সময়ে অর্থাৎ ১৫০২ খ্রীঃ অব্দে নবদ্বীপে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে পরাস্ত করায় নবদ্বীপবাসীগণ তাঁহাকে "বাদিসিংহ" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত আরও পরের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত বিবাহের পর ১৫০৬ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রীঃ অব্দে অধ্যাপক নিমাই পূর্ববঙ্গে যান। বৃন্দাবনদাস বলেন—পূর্ব্ববঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় তিনি পূর্ব্ববঙ্গে যান এবং দুই মাস তথায় থাকেন। জয়ানন্দ ও লোচনের মতে পূর্ববঙ্গে যাইবার উদ্দেশ্য ধন উপার্জ্জন—গৃহী অধ্যাপক নিমাইয়ের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন "ঘরে এলা প্রভু লঞা বহু ধন জন" কিন্তু তাঁহার অপর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,—

কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সংকীর্ত্তন॥ (চৈ. ভা,

আদি, ১৬ পঃ) বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ তখন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের ভিতর ভাবী শ্রীচৈতন্যদেবের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। অধ্যাপক নিমাই যখন পূর্ব্ববঙ্গে ছিলেন সেই সময়ে সর্পদংশনে তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়। যুবক নিমাই পত্নীর শোক সহ্য করিয়া মাতাকে প্রবোধ দিলেন—

প্রভু বোলে মাতা! ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিব কেমনে?
এই মত কাল-গতি—কেহ কার নহে।
অতএব 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে॥ চৈ. ভা, আদি, ১০ পঃ)

আমাদের মনে হয়, লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুতে 'সংসার অনিত্য, কেহ কার নহে' এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ই ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসের সূচনা করিতেছে।

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর তরুণ অধ্যাপক নিমাই দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাবনদাস যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় নিমাই পণ্ডিত সেই সময়ে শিরঃপীড়া বা বায়ুরোগে ভুগিতেন।

চতুর্দ্দিগে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পঢ়াযেন প্রভু মহাকুতূহলী॥
বিষ্ণুতেল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজরসে॥ (চৈ. ভা, আদি, ১০২)

১৫০৫ খ্রীঃ অব্দে বুদ্ধিমন্ত খান প্রভৃতির চেষ্টায় রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হয়। বুদ্ধিমন্ত এই বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করেন।

ইহার পর নিমাই পণ্ডিতের জীবনের প্রধান ঘটনা গয়া গমন। ১৫০৮ খ্রীঃ অব্দে অকৃটোবর মাসে তিনি পিতৃকৃত্য করিতে গয়ায় যান। চৈতন্যভাগবত মতে তাঁহার গয়া গমনের কিছু পূর্ব্বে হরিদাস ঠাকুর নদীয়ায় আসেন। হরিদাস ঠাকুর কোন্ সময়ে প্রথম নবদ্বীপে আসেন তাহা লইয়া বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, ও কবিরাজ গোস্বামীর মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সেই আলোচনা এখানে অপ্রাসংগিক। গয়াধামে যথারীতি পিতৃকৃত্য করার পর ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে "দশক্ষর মন্ত্রে" দীক্ষা লাভ করেন। গয়াধামে পাদপদ্ম দর্শন ও দীক্ষা-গ্রহণ করিবার পরই নিমাই পণ্ডিতের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি নবদ্বীপে না ফিরিয়া মথুরা যাইবার সঙ্কল্প করিলেনঃ

প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥ (চৈ. ভা, আদি, ১২ অঃ)

এইখানেই চৈতন্যের জীবনে সর্ব্বপ্রথম বিরহিনী রাধাভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস বলেন, দৈববাণী শুনিয়া তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। ইহা ১৫০৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসের কথা। গয়া হইতে অধ্যাপদ নিমাই নূতন মানুষ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন আসিল। তাঁহার ব্যবহার বিনম্র হইয়া গেল এবং পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য ও চাপল্য আর রহিল না।

পূর্ব্ব-বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোনজন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥ (চৈ. ভা, মধ্য, ১ম পঃ)

তাঁহার দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন অসাধারণ কৃষ্ণভক্তি। গয়া-যাত্রার পূর্ব্বে অধ্যাপক নিমাই বৈষ্ণব দেখিলেই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উপহাস করিতেন এমন কি শ্রীবাসের মতন বয়োজ্যেষ্ঠ ও পূজনীয় ব্যক্তিকেও তিনি নানাভাবে বিব্রত করিতেন।

শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা বাক্য-ব্যয় ভয়ে সভে পলাযেন॥
সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহ শেষ উপহাসে॥ (চৈ. আ, ৭ পঃ)

গয়া হইতে ফিরিযা আসার পর নিমাই পণ্ডিতের সহিত শ্রীমান পণ্ডিতের দেখা হয়। নিমাই তাঁহার নিকট বৈষ্ণব-সমাজেব সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, শ্রীমান পণ্ডিত তাহা বৈষ্ণব-সমাজে জানাইবাব সময বলিতেছেন—

পবম অদ্ভুত কথা বড অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥
....
পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নযনের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্ব-অঙ্গ মহাকম্প পুলকে পূর্ণিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পডিল ভূমিত॥ (চৈ. ভা, মধ্য, ১ম পঃ)

গয়া যাইবার পূর্ব্বে অধ্যাপক নিমাইয়ের কৃষ্ণ-ভক্তির অভাব দেখিয়া সেই সময়কার বৈষ্ণব সমাজ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, কাজেই এই সংবাদে তাঁহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল। পরবর্ত্তী কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহাকে অভেদ মনে করা হইয়াছে তাঁহার বৈষ্ণবভাব দেখিয়া যে বৈষ্ণব-সমাজ বিস্মিত হইয়াছেন ইহা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবদের স্নেহের ভাব দেখা যায়, শ্রদ্ধার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

সভে মিলি করিতে লাগিল আশীর্ব্বাদ।
হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥ (চৈ. ভা, মধ্য ১ম পঃ)

বৈষ্ণব সমাজের আর একটি ব্যবহার এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হওযায তাঁহাদের আনন্দ স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহারা পাষণ্ডীদলন হইবে ভাবিযা আরও উল্লসিত হইলেন। নবদ্বীপের সমসাময়িক যে রাজনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি তাহাতে নবদ্বীপের জনসাধারণ বিশেষ করিযা বৈষ্ণব সমাজ অত্যন্ত উদ্বেগে কাল কাটাইতেছিলেন এবং তাঁহারা শাসক সম্প্রদায ও পাষণ্ডীদের উচ্ছেদ কামনা করিতেছিলেন। তাই গৌরাঙ্গ নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কাছে মহাভারতের চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার তৃতীয পরিবর্ত্তন অধ্যাপক-লীলার অবসান। নিমাই উদীয়মান অধ্যাপক এবং ব্যাকরণের স্বাধীন টীকাকার। অধ্যাপনায় তাঁহার খ্যাতিও খুব ছিল, এমন কি পূর্ব্ববঙ্গে পর্য্যন্ত তাঁহার টীকার সমাদর ছিল। নিমাই গয়া হইতে ফিরিযা আসিবার পর স্বীয অধ্যাপক গঙ্গাদাসের সহিত দেখা করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে অধ্যাপনা করার উৎসাহও পাইলেন। কিন্তু অধ্যাপনায তাঁহার আর মন বসে না, অসার আলোচনাও তাঁহার ভাল লাগে না। তাঁহার মন শুধু কৃষ্ণ-রসে পূর্ণ। কিন্তু তবুও তিনি অনেকবার অধ্যাপনার চেষ্টা করিযাছেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি ব্যাকরণের স্থত্র ব্যাখ্যা করিতে গিযা দার্শনিক ও ভক্তি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন। ছাত্রদের পাঠের পক্ষে তাহা স্থবিধাজনক হইত না। কারণ তাহারা উপাধি লাভের জন্য আসিয়াছেন, বিশ্বের চরম তত্ত্ব জানিতে তো আসেন নাই। চারি মাস এইরূপ চেষ্টার পর এই তরুণ অধ্যাপক তাঁহার প্রিয় অধ্যাপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শ্রীচৈতন্য তাঁহার ছাত্রদের বারবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ নাম করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের এ আহ্বানে তরুণ ছাত্র সমাজ সাড়া দেয় নাই। কিন্তু প্রৌঢ় বৈষ্ণবগণ ও 'দরিদ্র আচণ্ডাল' সাড়া দিয়াছিল। সেই সময়কার তরুণ ছাত্রসমাজ প্রচলিত পথ ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই।

গয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর তাঁহার অপর পরিবর্ত্তন—গার্হস্থ্যজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। গয়া হইতে ফিরিযা নিমাই একবৎসর গৃহে ছিলেন, কিন্তু তিনি সত্যকার গৃহী ছিলেন কিনা সন্দেহ।

লক্ষ্মীরে (বিষ্ণুপ্রিয়া) আনিয়া পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥
কখনো কখনো বা হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণ-রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে॥ (চৈ. ভা, মধ্য, ১ম পঃ)

গয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর শ্রীচৈতন্যের বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥

(চৈ. ভা, মধ্য, ১ম পঃ)

ইহা অবশ্য কৃষ্ণ-বিরহের অবস্থা, কিন্তু ইহা বায়ুর জন্যও হইতে পারে। কারণ শ্রীবাস নিমাইয়ের এই অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন "মহাভক্তিযোগ—বায়ু বলে কোন জন", বায়ুরোগ মানসিক ব্যাধি এবং নিমাই-এর মন যে এই সময়ে সুস্থ ছিল না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ-বিরহও বায়ু-ব্যাধির কারণ হইতে পারে। বায়ু-ব্যাধি ছিল না বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। কারণ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বলিয়াছেন "মৃগী ব্যাধিতে আমি হই অচেতন" (চৈ. চ, মধ্য, ১৮ পঃ)। কবিরাজ গোস্বামীও বায়ুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা নিমাইয়ের স্বেচ্ছাকৃত ছলনা বলিয়াছেন। গযা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিমাই অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে বৈষ্ণব সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিযা তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

১৫০৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক নিমাই গয়া হইতে নবদ্বীপ ফিরিয়া আসেন এবং ১৫১০ খ্রীঃ অব্দের জানুযারী মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময়কার প্রধান ঘটনা অদ্বৈত, শ্রীবাস-প্রভৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও অবশেষে অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ; হরিদাস ও নিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং সংকীর্ত্তন প্রচার। জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং কাজীদলনও ইহাদের অন্যতম।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ ভাগে শ্রীক্ষেত্রের গম্ভীরায় অবস্থানকালে যে দিব্যোন্মাদের চিত্র আমরা পাই, এই পর্ব্বে তাহার উন্মেষ লক্ষিত হয়। রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে আকুতি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণভাবে ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি প্রকাশই চৈতন্য জীবনের এই পর্ব্বের বিশেষত্ব। তাঁহার জীবনচরিতকারদের

মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবন দাসই এই পর্ব্বের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই নির্ভরযোগ্য। তাঁহার ‘চৈতন্য ভাগবত’ হইতে আমরা যে চিত্র পাই তাহা আমাদের উপরোক্ত উক্তি সমর্থন করে,—

বরাহ আকার প্রভু হইলা সেই ক্ষণে।
স্বানু ভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞবরাহ প্রকাশে খুব চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি বলহ মুরারী॥ (চৈ. ভা, মধ্য, ৩য় পঃ)

এই পর্ব্বে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা চন্দ্রশেখরের ভবনে নিমাইযের রুক্মিনী-বেশে নৃত্য। জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর এই অনুষ্ঠান হয। আমাদের মনে হয, যে মহান উদ্দেশ্য লইযা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তাহার একটি পর্ব্ব শেষ হইল অর্থাৎ জগাই-মাধাইযের মতন পাষণ্ডী তাহাদের পূর্ব্ব আচরণ ত্যাগ করিযা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল। শ্রীচৈতন্যের অপর উদ্দেশ্য প্রেমধর্ম্ম স্থাপন করা ; রুক্মিনী-বেশে নৃত্য করিযা নিমাই তাহার পূর্ব্বভাস দিলেন।

১৫১০ খ্রীঃ অব্দেব ফেব্রুযারী মাসে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার নিমাই সন্ন্যাস-গ্রহণেব সঙ্কল্প করিযা গৃহত্যাগ করেন। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন কাটোযাতে কেশব-ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কেশব-ভারতী তাঁহাকে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নাম দিলেন। দীক্ষার পর নিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরে লইযা আসেন এবং সেখানে শচী-দেবীব সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয। মাযের অনুমতি লইযা ফেব্রুযারীর শেষ সপ্তাহে তিনি নীলাচল গমন করেন। জীবনেব শেষ চব্বিশ বৎসর নীলাচলেই স্থাযীভাবে বাস করেন। ইহার মধ্যে ছয বৎসর দেশ পর্য্যটনে কাটিয়াছে।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-যাত্রার সঙ্গী হইযাছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ অন্যতম। সেই সময় গৌড় ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। সেইজন্য অনেকেই তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য কোন নিষেধই শুনিলেন না। ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত ছত্রভোগে আসার পর জনৈক রামচন্দ্র খানের সহায়তায় তিনি নদী পার হইলেন। পথে সুবর্ণরেখার তীরে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের দণ্ডভঙ্গ করেন। জাজপুর, কটক প্রভৃতি স্থান হইয়া তাঁহারা জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য একাকী জগন্নাথ দর্শন করিতে যান এবং ভাবের আবেশে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময বাসুদেব সার্ব্বভৌম মন্দিরে উপস্থিত

ছিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দও অপর সঙ্গীসহ সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে আসিলেন। ফাল্গুনের শেষে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, আর পর বৎসর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে, অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নীলাচল ত্যাগ করেন। এই সময়ের বিশেষ ঘটনা সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহার বিচার। সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারের বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন-দাসের বর্ণনা অনুসারে সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যকে বেদান্তী বলিয়া ভ্রম করিয়া ভক্তির কথা বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার নিকট ভাগবত-পাঠ শুনিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের এই তরুণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্য ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন যে তিনি সন্ন্যাসের ঊর্দ্ধে, এবং সার্বভৌমের কাছে তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাহা সাধুর উদ্ধার ও দুষ্টের বিনাশ হেতু। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা মতে সার্ব্বভৌম অদ্বৈতবাদী এবং শ্রীচৈতন্যকে তিনি বেদান্ত পড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাত দিন সমানে নির্ব্বাক শ্রোতা শ্রীচৈতন্যকে সার্ব্বভৌম ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি তো কোন প্রশ্নই করিতেছ না সুতরাং তুমি কিছু বুঝিতে পারিতেছ কিনা তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। তাহাতে শ্রীচৈতন্য বলিলেন—

> প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
> তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
> ... ...
> জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
> মায়াবাদি ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
> ... ...
> জীবের দেহে আত্ম বুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।
> জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয়॥ (চৈ. চ, মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ)

১৫১০ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ) শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির হন। পুরী হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ—সেখান হইতে সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভাস হইয়া পুনরায় গোদাবরী তীরে আসেন এবং সেখান হইতে ১৫১২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারীর মধ্যভাগে পুরী ফিরিয়া আসেন।—তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের মোট সময় ১ বৎসর

৮ মাস ২৬ দিন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে গোবিন্দ কর্ম্মকার তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

গোবিন্দ কর্ম্মকার ও গোবিন্দ দাসের কড়চা লইয়া পণ্ডিত সমাজে মতভেদ আছে। যাঁহারা এ বিষয়ে কৌতূহলী, তাঁহারা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "গোবিন্দ দাসের কডচার ভূমিকা" ভক্তি-বিনোদ মৃণালকান্তি ঘোষের "গোবিন্দ দাসের কড়চা-রহস্য" ও ৺জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত "গৌরপদতরঙ্গিনী"র ভূমিকার ১২৬-১৫১ পাতা পড়িয়া দেখিবেন। ঐ আলোচনা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীচৈতন্য বেদান্তী সার্ব্ব-ভৌমের মতবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তারপর "আত্মারাম" শ্লোকের ব্যাখ্যার পর প্রথমে "চতুর্ভুজ পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ" দেখাইলেন।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সাধারণ উদ্দেশ্য মনে হয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার। কিন্তু রায় রামানন্দের সহিত মিলনই দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের প্রধান ঘটনা। অপর দুইটি হইতেছে ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত পুঁথির সহিত পরিচয়। রায় রামানন্দের সম্বন্ধে চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। রামানন্দের নিকট হইতে শ্রীচৈতন্য যে তত্ত্ব পাইলেন, সেই রাগানুগা-ভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূল কথা। আমরা স্থানান্তরে তাহা আলোচনা করিয়াছি সেজন্য এখানে আর তাহার আলোচনা করিব না। একটি তথ্য এখানে পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। চৈতন্যভাগবতে আমরা দেখিতে পাই যে পাষণ্ডী-দলন ও জীব-উদ্ধারের জন্য তাঁহার অবতার এবং তিনি নিজেও বারবার 'সংহারিমু' 'সংহারিমু' বলিতেছেন। রায় রামানন্দের কাছে কিন্তু তিনি বলিতেছেন—

> গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
> গোপেন্দ্র সুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
> তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন।
> তবে কৃষ্ণ মাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন॥ (চৈ. চ, মধ্য ৮ম পঃ)

গোদাবরীর তীর হইতে শ্রীচৈতন্যের অবতার মুখ্য ভাবে রাধিকাতে পরিণত হইলেন। নবদ্বীপে যে লীলা করিলেন তাহাও অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং রসরাজ ও মহাভাব স্বরূপ এক হইয়া গেলেন এবং সেই জন্যই শ্রীচৈতন্য চলিত ভাবে অন্তর্কৃষ্ণ ও বহির্গৌর—কৃষ্ণ হইতে রাধিকায় রূপান্তর। নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে যে লীলা প্রকাশ, তাহা মহাপ্রভুর জীবনে এক

অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তনের চরম বিকাশ গম্ভীরায় দিব্যোন্মাদ অবস্থা।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্য দুই বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থান করিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং তিনি "জননী ও জাহ্নবী" দর্শনের জন্য গৌড়দেশ দিয়া চলিলেন। পথে রামকেলী গ্রামে গৌড়েশ্বরের দুই জন হিন্দু মন্ত্রী গোপনে তাঁহার সহিত দেখা করেন। ইহারাই পরে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে বিখ্যাত হন। শ্রীচৈতন্য রামকেলী হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে যান, সেখানে শচীদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং ১৫১৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন।

১৫১৫ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবর মাসে তিনি ঝাড়িখণ্ডের পথে পুনরায় বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করেন। কিন্তু এই ভ্রমণের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান ঘটনা রূপ ও সনাতনের সহিত মিলন এবং উভয়কে শিক্ষাদান। প্রয়াগে রূপ তাঁহার অনুজের সহিত আসিয়া শ্রীচৈতন্যের শরণ লইলেন। দশদিন ধরিয়া মহাপ্রভু

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥ (চৈ. চ, মধ্য ১৯শ পঃ)

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীরূপ বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর কাশীধামে সনাতন আসিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন এবং দুইমাস ধরিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ব্যূহতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিলেন। সনাতনকে মহাপ্রভু বলিলেন—

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসনে বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার॥ (চৈ. চ, মধ্য ২৩শ পঃ)

কাশীধামে বৈদান্তিক প্রকাশানন্দের সহিত বিচার করিয়া শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত

মত খণ্ডন করেন এবং ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আর তিনি নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার নীলাচল বাসের কাল দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বৈষ্ণব স্মৃতি ও ভক্তিতত্ত্ব প্রণয়ন করিতেছিলেন, আর শ্রীচৈতন্যের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় দেশে আচণ্ডালে এই নবমত প্রচার করিতেছিলেন ১৫২২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য এই দুইটি জায়গার সহিতই যোগাযোগ রাখিযাছিলেন ; ১৫২২ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদের ন্যায যাপন করিয়াছেন। তাঁহার সেই দিব্যোন্মাদের অবস্থা অতুলনীয় এবং তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই পর্ব্বে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বৃন্দাবন হইতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত দেখা করেন। এই সময়ে শ্রীরূপ তাঁহার দুইটি নাটক ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব মহাপ্রভুকে শোনান ও তাঁহার অনুমোদন পান। শ্রীসনাতন যখন নীলাচলে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত শরীরে কণ্ডু হওয়ায় তিনি আত্মবিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিযা তাঁহাকে বলিলেন—

> দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
> কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায কোন নাই ভক্তি বিনে॥ (চৈ. চ, অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

হরিদাস ঠাকুরের দেহরক্ষা, ছোট হরিদাস-বর্জ্জন প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে এই পর্ব্বে মহাপ্রভুর জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা নাই। এই পর্ব্ব মহাপ্রভুর জীবনে প্রেমের পর্ব্ব ; তিনি দিবারাত্রি কৃষ্ণের প্রেম অন্তরে আস্বাদ করিতেছেন এবং প্রিযতম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুল হইযা থাকিতেন। তাঁহার কখনও বাহ্যজ্ঞান থাকিত, কখনও বা সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত,—আবার কখনও বা ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

> কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তি।
> কভু বাহ্য স্ফূর্ত্তি তিন রাতে প্রভুর স্থিতি॥
> স্নান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয।
> কুমারের চাক যেন সতত ফিরয॥ (চৈ. চ, অন্ত্য ১৫ শ পঃ)
> তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।
> অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধ-বাহ্য আর॥
> অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
> সেইদশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥

অৰ্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।

আকারে কহেন সব শুনে ভক্তগণে। (চৈ. চ, অন্ত, ১৮ শ পঃ)

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি রচনা করেন এবং উজ্জ্বলনীলমণি রচিত হইবার পর কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ শেষ করেন। মহাপ্রভুর অবস্থার বর্ণনা শুনিয়াই হয়ত শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণিতে দিব্যোন্মাদের লক্ষণ দিযাছেন, আবার ইহাও হইতে পারে যে দিব্যোন্মাদের সমস্ত লক্ষণ কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর উপর আরোপ করিযাছেন। তাঁহার জীবনের এই পর্ব্বের ইতিহাস একমাত্র কবিরাজ গোস্বামীই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান, অৰ্দ্ধ-বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যজ্ঞানশূন্য সম্পূর্ণভাবে মগ্ন—এই তিন অবস্থাকেই কবিরাজ গোস্বামী দিব্যোন্মাদ বলিযাছেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতরা রাধার যেরূপ অবস্থা হইযাছিল মহাপ্রভুরও সেই অবস্থা হইযাছিল—

কৃষ্ণের বিযোগে গোপীর দশ দশা হয।

সেই দশ দশা হয প্রভুর উদয়॥

এই পর্ব্বে মহাপ্রভুর আর একটি লক্ষণ দেখা যায—সেটি ভ্রম। যে জিনিস যাহা নয, তাহাকে সেই জিনিস জ্ঞান করার নাম ভ্রম। এইরূপ ভ্রমকে দিব্যোন্মাদের একটি লক্ষণ বলিযা শ্রীরূপ গোস্বামী অভিহিত করিযাছেন। এই ভ্রমের কারণ তাঁহার তীব্র ও অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেম। তিনি যমুনা ভ্রম করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছেন এবং চটক পাহাড়কে গোবর্দ্ধন ভ্রম করিতেছেন; এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওযা যায। এই অবস্থায় মহাপ্রভুর দেহ নীলাচলে, কিন্তু তাঁহার মন বৃন্দাবনে চলিযা গিযাছে—নীলাচলে থাকিযাও তিনি বৃন্দাবনের রসমাধুরী আস্বাদন করিতেন। ইহা প্রাকৃত অবস্থা নহে, কারণ এই অবস্থায় অপ্রাকৃতের বস্তুসকল প্রাকৃত বস্তুর ন্যায দৃষ্ট হয। এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীচৈতন্য যখন ভাবে মগ্ন থাকিতেন তখন—

ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।

ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায রামানন্দ॥

মধ্যে মধ্যে আপনি প্রভু শ্লোক পড়িয়া।

শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥ (চৈ. চ, অন্ত ১৭শ পঃ)

লীলা নিত্য, তাহার শেষ হইতে পারে না। সেইজন্য চৈতন্যদেবের

তিরোধানের পরও তাঁহার লীলা চলিতেছে। যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহারা সেই লীলা দেখিয়া ধন্য হন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

কিন্তু প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় আচরণ যিনি করেন তাঁহার তিরোধান প্রাকৃত কারণেই হওয়া স্বাভাবিক এবং তাহার অন্যথা হওয়াই অস্বাভাবিক। দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসানের সময় প্রাকৃত কারণেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সামান্য এক ব্যাধের তীরে আঘাত পাইয়াই মহাভারতের নায়ক, অর্জ্জুন-সখা, গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ দেহরক্ষা করিলেন। যুগাবতার পরমহংসদেবও প্রাকৃত কারণেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং কোন প্রাকৃত কারণ অবলম্বন করিয়াই যে মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট লীলার অবসান করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার ‘চৈতন্য-চরিতের উপাদান’ নামক গ্রন্থে ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখার্জ্জী এম-এ, ডিপ্লোমা (এডিন) তাঁহার The History of the Medieval Vaisnavism in Orissa নামক গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলাবসান সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা উক্ত দুই গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া মহাপ্রভুর লীলাবসান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) উড়িয়া ভাষায় লেখা অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতা হইতে জানা যায়, মাধব অর্থাৎ বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হইয়া যান।

(২) উড়িয়া ভাষায় দিবাকরদাস কর্ত্তৃক লিখিত জগন্নাথ-চরিতামৃত হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হইয়া যান।

(৩) উড়িয়া ভাষায় ঈশ্বরদাস কর্ত্তৃক রচিত চৈতন্য ভাগবত অনুসারে বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হইয়া যান এবং গোমতী তীর্থে প্রাচী নদীর তীরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

(৪) উড়িয়া ভাষায় লেখা কবিসূর্য্য সদানন্দের প্রেম তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে মহাপ্রভু আটচল্লিশ বছর বয়সে টোটা গোপীনাথ নামক স্থানে অন্তর্দ্ধান করেন।

(৫) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে আমরা জানিতে পারি যে আষাঢ় মাসে রথের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু বামপদে আঘাত পান। সেই

ক্ষত দূষিত হওয়ায় কাশীমিশ্রের বাগানে তাঁহার চিকিৎসা হয় এবং শুক্লপক্ষের সপ্তম দিবসে বেলা দশটার সময় তিনি দেহরক্ষা করেন। এই তিরোধানের তারিখ ২৯শে জুন ১৫৩৩ খৃঃ অব্দ।

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
... ...
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
... ...
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥

(৬) লোচনদাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বলিয়াছেন যে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় গুণ্ডিচা বাড়ীতে মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হইলেন।

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
... ...
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন।
গুণ্ডাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥ (চৈ. ম, শেষখণ্ড)

(৭) ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশে' যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও দেখা যায় যে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল হা নাথ বলিয়া
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল॥
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা।
গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈলা॥ (অদ্বৈত প্রকাশ, ২১তি অধ্যায়)

(৮) কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে আমরা জানিতে পারি

যে সাতচল্লিশ বছর বয়সে মহাপ্রভু দিব্য ধামে গমন করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর আরও বলিয়াছেন যে চৈতন্যদেব এই মরজগতের নহেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে না।

(৯) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

(১০) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লীলার অবসান কি ভাবে হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এই মাত্র বলা হইয়াছে যে এই মরজগতে তিনি ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত-সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥ (চৈ. চ, আদি, ১৩ পঃ)

(১১) শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু গোপীনাথে লীন হইয়াছেন।,

(১২) স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন যে ১৪ই জুন ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে চৈতন্যদেব দেহরক্ষা করেন।

(১৩) ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতে ১৪৫৫ সনের ৩১শ আষাঢ়, শুক্লা সপ্তমীতে রবিবার তৃতীয় প্রহরে (ইংরাজী তারিখ ২৯শ, জুন ১৫৫৩ খ্রীঃ অব্দ) শ্রীচৈতন্য এই নরজগৎ ত্যাগ করেন এবং তিনি মোট ৪৭ বছর, ৪ মাস এবং ১০।১২ দিন জীবিত ছিলেন। ডঃ মজুমদার জয়ানন্দের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তাঁহার মতে গদাধর পণ্ডিতের বাড়ীতে মহাপ্রভু দেহরক্ষা করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দ বর্ণিত প্রাকৃত কারণ গ্রহণ করিয়াছেন তবে তিনি মনে করেন যে গুণ্ডিচা-বাড়ীতে মহাপ্রভুর শবদেহ সমাধিত করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও জয়ানন্দের কথাই মানিয়া লইয়াছেন। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে রাজাপ্রতাপরুদ্রের পরিকরগণ মহাপ্রভুকে হত্যা করে এবং তাঁহার শ..দেহ লুকাইয়া ফেলে। অবশ্য তাহাদের ঐরূপ করিবার ঐতিহাসিক কারণ আছে। প্রতাপরুদ্র রাজ কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া একান্ত ভাবে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুতরাং জগন্নাথের পাণ্ডাগণ ও প্রতাপরুদ্রের অমাত্যগণের পক্ষে ঐরূপ গুপ্ত হত্যা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এসম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু জগন্নাথে বা গোপীনাথে মহাপ্রভু লীন

হইয়াছেন ইহা প্রায় সকল চরিতকারগণ বলায় গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত—শ্রীবৃন্দাবন দাস (বসুমতী সং)
(২) শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ (বঙ্গবাসী সং)
(৩) লোচন দাসের চৈতন্য-মঙ্গল—ভক্তিভূষণ শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত।
(৪) জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল—সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ।
(৫) গোবিন্দ দাসের কড়চা—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।
(৬) শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী—৺জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত।
(৭) শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—ঈশান নাগর—ভক্তিভূষণ শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত (৩য় সং)
(৮) ভক্তি-রত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী।
(৯) চৈতন্য চরিতের উপাদান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।
(১০) The History of the Medieval Vaisnavism in Orissa
—Prabhat Kumar Mukerjee, M. A.
(১১) Chaitanya & His Age—Dr. Dines Chandra Sen.
(১২) Chaitanya and His Companions— Do
(১৩) India Through the Ages—Sir Jadunath Sarkar.
(১৪) Early History of the Vaisnava Faith and Movement—Dr. S. K. De.
(১৫) গোবিন্দ দাসের কড়চা রহস্য—ভক্তিভূষণ শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।
(১৬) History of Bengal (Vol. II)—Edited by Sir Jadunath Sarkar.
(১৭) বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—শ্রীগিরিজাশংকর রায় চৌধুরী।
(১৮) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিত মৃতম্—শ্রীমুরারি গুপ্ত (শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত)

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যকে আদর্শ করিয়া এবং তাঁহারই মৌখিক উপদেশ ও শিক্ষার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের উদ্ভব, এবং তাঁহারই আদেশে ইহার পুষ্টি ও বিস্তার হইয়াছে কিন্তু এই ধর্ম্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত কি এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধনা, দীক্ষা ও আচার প্রণালী কিরূপ তাহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য নিজে কিছুই লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে মৌখিক উপদেশ পাইয়া শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতনগোস্বামী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ইঁহাদের নিকট শিক্ষা পাইয়া ও ইঁহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীজীব-গোস্বামীও অনেক গ্রন্থ রচনা করিযাছেন। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী কৃত ললিত-মাধব ও বিদগ্ধ-মাধব নামক দুইটি নাটক ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ যে শ্রীচৈতন্য দেখিয়াছিলেন এবং অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীসনাতনগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত গ্রন্থসমূহ ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব-নির্ণায়ক অন্য কোন গ্রন্থ নাই। বিশেষ করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্ সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনটি শব্দ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বেরই নামান্তর এবং এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক ব্যবহার করেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যাতে॥ (ভা. ১।২।১১)

সেই অখণ্ড চিদানন্দ স্বরূপকে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন রূপে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন সাধকের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়াই ধরা হয়। যেমন ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি যখন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ লোক দেখে, তখন সেই শাড়ী তাহার কাছে যে রংএর মনে হইবে, অন্য আর একটি বিশেষ স্থান হইতে যিনি দেখিতেছেন তাঁহার কাছে আর তাহা মনে হইবে না। আবার ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী নানা বর্ণময় হইলেও প্রধান যে একপ্রকার বর্ণ বিশেষ, তাহাই ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী; তাহার প্রধান যে

বর্ণ আছে তাহার মধ্যে অন্য সমস্ত বর্ণ অন্তর্হিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ পট্টবস্ত্র বিশেষ, তাঁহার প্রধান বর্ণের মধ্যে অন্য সব বর্ণ মিশিয়া যায়। নারদ পাঞ্চরাত্রেও অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায় এবং এই তত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ তাহা উদ্ধৃত করা গেল :

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ (গ. প. রা)

অর্থাৎ মণি (বৈদুর্য্য) যেমন বিভক্তভাবে নীলপীতাদি বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধ্যানভেদ-বশত অচ্যুত (শ্রীহরি) ও রূপ-ভেদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা এখানে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান শব্দের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ শব্দ প্রয়োগ করিলাম। ব্রহ্মসংহিতায আমরা দেখিতে পাই যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মের বিভূতি সেই ব্রহ্ম আবার গোবিন্দের স্বরূপ—

যস্যপ্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি,
কোটিষ্বশেষ—বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্ম সংহিতা ৫,৪০)

গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ যে অভিন্ন তাহাও ব্রহ্মসংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদি আদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম॥ (৫।১)

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। ব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষে), আত্মা (পরমাত্মা) ও ভগবান্—এই তিন একই শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বৈচিত্রী বা স্বরূপ। একই তত্ত্ব হইয়া তিনি জ্ঞানমার্গ সাধকের নিকট নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গ উপাসকের নিকট পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গের উপাসকের নিকট ভগবানরূপে প্রতিভাত হন। রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি কলা বা অংশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—

এতে চাংশ কলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ (ভা. ১।৩।৩৮)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ন্যূনতম শক্তি বলিয়া ভগবদ্ গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্॥" আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। মুণ্ডকোপনিষদও ঈশ্বর-পুরুষকে ব্রহ্মের হেতুভূত বলিয়াছেন—

"যদাপশ্যঃপশ্যতে রুক্নবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ (৩।১।৩)
শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ"।
(চৈ, চ, আঃ, ২য় পঃ)

অর্থাৎ যিনি একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব এবং যাহা ব্যতীত অপর কোন স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নাই। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় হওয়ায় তাঁহার স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-এই তিন প্রকার ভেদের কোন প্রকার ভেদ নাই। রাম নৃসিংহাদি পৃথক ভাগবত স্বরূপ কিন্তু তাঁহারা স্বযংসিদ্ধ নহেন এবং তাঁহাদের সত্তা শ্রীকৃষ্ণের সত্তার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ, স্বজাতীয়, ভেদশূন্য, ও বিজাতীয় ভেদ হইল ভিন্নজাতীয় ভেদ, যেমন শ্রীকৃষ্ণ চিৎ-জাতীয় এবং ব্রহ্মাণ্ড জড় জাতীয় কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের পৃথক সত্তা নাই, শ্রীকৃষ্ণের সত্তার উপর নির্ভর করে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বযংসিদ্ধ-বিজাতীয় ভেদশূন্য। আর স্বগত ভেদ হইল দেহ-দেহী ভেদ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ দেহ ও দেহী ভেদ নাই। তিনি সচ্চিদানন্দ, চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণে দেহ ও আত্মা পৃথক নহে। যেমন লবণ পিণ্ডের সর্ব্বত্রই লবণ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই সেইরূপ ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বত্রই আনন্দ, তাহাতে আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। "স যথা সৈন্ধব ঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘন এব এবং বা অরে অয়মাত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞাঘন এব"। (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩) সুতরাং দেহী-কৃষ্ণ একবস্তু, তাঁহার দেহ আর এক বস্তু তাহা সত্য নহে। কূর্ম্মপুরাণ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নাই—(দেহ দেহিভেদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ)। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং নরাকৃতিম্" (৪।১১।২) এই প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরদেহধারী, গোপাল তাপিনীতেও এইরূপ বলা হইয়াছে—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্ দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিমীশ্বরম্" (গোঃ, তাঃ, পৃঃ ২।১)। কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥ (চৈ, চ, মধ্য, ২১শ পঃ)

শ্রীকৃষ্ণ 'মধুরৈশ্বর্য-মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার', (চৈ, চ, মধ্য, ২১শ পঃ) তাঁহার রূপ ও গুণাদির মাধুর্য্যের কোনও সীমা নাই। কারণ—

যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ (চৈ, চ, মধ্য, ২১শ পঃ)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও মাধুর্য সর্ব্বপ্রাণীকে আকর্ষণ করে। ত্রিভুবনের সমস্ত সাধারণ প্রাণীকে যে কেবলমাত্র আকর্ষণ করে, তাহা নহে। পরমব্যোমে যে সমস্ত ভগবৎ স্বরূপ আছেন তাঁহাদের, এমন কি লক্ষ্মীগণকেও আকর্ষণ করে—

কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ
তা-সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ (চৈ, চ, মধ্য, ২১শ পঃ)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আবাব এমন একটি শক্তি আছে যাহা ত্রিভুবন, ভগবৎ-স্বরূপ ভক্তগণ এবং লক্ষ্মীদেবীগণকে আকর্ষণ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই সে মাধুর্য্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আকর্ষিত হন—

(১) কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর-নারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ (চৈ, চ, আদি, ৪র্থ পঃ)

(২) আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ (চৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ)

(৩) অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধ চেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ (ললিতমাধব ৮।৩২)

অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের বর্ণনা করা অসম্ভব—ইহা অনুভব করার বিষয়, নিজের অন্তরে এই মাধুর্য্য যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, যেমন শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেব, তাঁহারা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পান নাই; কেবলমাত্র 'মধুর মধুর' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—

(১) মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ (কর্ণামৃত, ৯২)

(২) কৃষ্ণাঙ্গলাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই সুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর। (চৈ, চ, মধ্য ২১শ, পঃ)

শ্রীকৃষ্ণ সকল ঐশ্বর্য্যের আধার, কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভীতি উৎপাদন করে না বা সেই ঐশ্বর্য্যের গৌরবের জন্য অন্যের সঙ্কোচ উৎপাদন করে না; শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও তাঁহার মাধুর্য্যের অনুগত। সাধারণত ঐশ্বর্য্য বা বিভূতিকেই ভগবত্তার সার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে মহান ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহাতে মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার—ঐশ্বর্য্য নহে।

মাধুর্য্য-ভগবত্তা-সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন। (চৈ, চ, মধ্য ২১শ পঃ)

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সর্ব্বকারণের কারণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় এবং তাঁহার মাধুর্য্যের তুলনা নাই; তিনি আবার রসিকশেখর। তিনিই "রসো বৈ সঃ।" রসের আস্বাদ্য এবং আস্বাদক উভয়ই তিনি। তিনি আস্বাদ্য হওয়ায় তাঁহাকে আস্বাদন করিবার জন্য সকলে লালায়িত হইয়া উঠেন, তাই তিনি "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।" শ্রীরাধার সান্নিধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ থাকেন তখন তাঁহার মাধুর্য্যের চরম বিকাশ হয় এবং তখন তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইলেও, যখন যে শক্তির সাহচর্য্যে লীলা করেন তখন সেইরূপ ভাবেই তাঁহার ভগবত্তার বিকাশ হয়। মা যশোদার কোলে যখন থাকেন তখন তাঁহার মাধুর্য্যে মন্মথ মূর্চ্ছিত হয় না। তাই রসের দিক দিয়া বিচার করিলে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপই রসের স্বরূপ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবতত্ত্বের আলোচনা করিব। মানুষ, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম প্রভৃতি সকলেরই দেহ, জন্ম ও মৃত্যু আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেহটি সচেতন। মৃত্যুর পর দেহ থাকে না কিন্তু চেতনা থাকে। কাজেই দেহের মধ্যে এমন একটি জিনিষ ছিল যাহা নিজে চেতন এবং দেহকেও চেতন করিয়াছিল। এই চেতনকেই জীব বলা হয়। দেহ জীব নয়, কারণ দেহের নিজের চেতনা নাই, জীবের আছে। এই যে

চেতনাময় জীব তাহাকে জীবাত্মা বা জীবস্বরূপও বলা হয়। এই যে জীব বা জীবাত্মা ইহা স্বরূপত ভগবানের শক্তি; কিন্তু এই যে জীবশক্তি তাহা ভগবানের অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তিও নহে এবং বহিরঙ্গ মায়াশক্তিও নহে, পৃথক একটি শক্তি বলিয়া ইহাকে তটস্থশক্তি বলা হয়। ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিতে আমরা সেই শক্তি বুঝি যে শক্তির দ্বারা "ভগবান নিজ পূর্ণস্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদি বৈভবরূপে অবস্থান করেন। তটস্থ শক্তির দ্বারা চিন্মাত্র স্বরূপ শুদ্ধ জীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গ মায়া শক্তির দ্বারা বহিরঙ্গ বৈভবস্বরূপ জড়াত্মক প্রধানাদিরূপে অবস্থান করেন।" গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব ভগবানের অংশ। ভগবানের অংশ আবার দুইরকম (১) স্বাংশ ও (২) বিভিন্নাংশ —তত্র দ্বিবিধাঃ অংশাঃ স্বাংশা বিভিন্নাংশাশ্চ। বিভিন্নাংশাস্তটস্থ শক্ত্যাত্মকা জীবা ইতি বক্ষ্যতে। স্বাংশাস্তু গুণলীলা অবতার ভেদেন বিবিধাঃ। (ষট্সন্দর্ভঃ, পরমাত্মা ৪৫) কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে ইহা এইরূপ ভাবে বলিয়াছেন—

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অধিষ্ঠান॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশে জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥ (চৈ, চ, মধ্য ২২তি পঃ)

জীবের কর্তৃত্ব আছে কিন্তু তাহা ভগবানের অধীন। তবে জীব নিজে ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে—ইহাই জীবের স্বতন্ত্রতা, কিন্তু এই ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবার শক্তি জীবের নাই। যেমন ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি করিতে জীবের ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু তাহা করিবার শক্তি জীবের নাই।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ কি অভেদ ইহা লইয়া বিতর্কের সীমা নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক বৈষ্ণব আচার্য্য-গণই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সিদ্ধান্ত অনুসারেও জীব ও ব্রহ্মে ভেদ রহিয়াছে। উপনিষদে যেমন ভেদবাচক বাক্য আছে তেমন আবার অভেদবাচক বাক্যও আছে। এমন কি একই উপনিষদে ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো (হে শ্বেতকেতু তুমিই সেই) ৬।৮।৭—ইহা অভেদসূচক বাক্য। সেই ছান্দোগ্য

উপনিষদেই আবার ভেদসূচক বাক্যও পাওয়া যায়, যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলনাতি শান্ত উপাসীত।" ৩।১৪।১ (সকলই ব্রহ্ম, শান্ত চিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে।) উপাসনা বলিলেই উপাস্য ও উপাসকের ভেদ কল্পনা করা হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই ভেদবাচক ও অভেদবাচক বাক্য পাওয়া যায়, যথা—অভেদবাচক বাক্য "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" (২।৪।১০); বৃহদারণ্যক উপনিষদে আবার ভেদসূচক বাক্যও পাওয়া যায়, যথা—"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি" ২।১।২০ (অর্থাৎ যেরূপ উর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণী, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত সৃষ্ট হইতেছে)। একই উপনিষদ হইতে যখন ব্রহ্ম ও জীবের ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্য পাওয়া যায় তখন জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে ভেদ আছে ইহা বলা যায় না, আবার সর্ব্বতোভাবে অভেদ আছে ইহাও বলা চলে না। উপনিষদ অর্থাৎ শ্রুতির বাক্য অপৌরুষেয় সুতরাং উভয় উক্তিই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন উক্তিই বর্জ্জন করা চলে না; সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই উভয় বাক্যের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চান যে জীব ও ব্রহ্মে ভেদও আছে অভেদও আছে এবং এই দুই সম্বন্ধই সমান সত্য। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ (চৈ, চ, মধ্য ২০শ পঃ)

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা লইয়া মতবাদের আর শেষ নাই। আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ **আত্যন্তিক অভেদ**। আবার মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে **আত্যন্তিক ভেদ**। জীব ও জগৎকে ভ্রান্তি মাত্র ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার অদ্বৈত বা অদ্বয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভগবানের কোন শক্তি তিনি স্বীকার করেন নাই। কারণ শক্তিকে স্বীকার করিলেই ভেদকেও স্বীকার করিতে হয়। ভেদবাদী মাধ্বাচার্য্যের মতানুসারে ব্রহ্ম ও জীব পৃথক তত্ত্ব ও পৃথক বস্তু। তবে ব্রহ্ম যেরূপ চিদ্বস্তু জীবও তেমনি চিদ্বস্তু এবং জীব ব্রহ্মের সমজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু,

ব্রহ্মের সমজাতীয় ভেদ। আচার্য্য রামানুজ বলেন **চিৎ** ও **জীব** এক এবং **অচিৎ** ও **মায়া** এক। এই চিৎ ও অচিৎস্বরূপ যিনি তিনিই ঈশ্বর। আচার্য্য রামানুজের সিদ্ধান্ত অনুসারে চিৎ ও অচিৎ স্বরূপ দুইটি পৃথক বস্তু। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অনুসারে যে অভেদ তাহা আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী **অদ্বয়তত্ত্ব** বা **অদ্বৈত তত্ত্ব** হইতে পৃথক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যদের প্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি উচ্যতে ॥ (ভা, ১।২।১১)

এইখানে পরতত্ত্ব বস্তুকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তাঁহারাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলেন, যথা—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ ॥ (চৈ, চ, আদি, ২য় পঃ)

কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত মতবাদ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অদ্বৈতমতবাদ এক নয়। কারণ, আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের **শক্তি** স্বীকার করেন না কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ "শক্তি" স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব (চিৎ) ও মায়া (অচিৎ) স্বরূপ আশ্রিত পৃথক, কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে চিৎ ও অচিৎ স্বরূপের শক্তি এবং স্বরূপ হইতে পৃথক নয়।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ভেদবাদীও নহেন অভেদবাদীও নহেন, কিন্তু তাহাদের **ভেদাভেদবাদ** গৌতম কণাদ প্রভৃতি হইতে ব্যাপক। (১) তাঁহারা শুধু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেই ভেদাভেদ সম্বন্ধ নির্ণয় করেন নাই, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম এবং অন্যান্য সমস্ত বস্তুর মধ্যেই এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই ভেদাভেদ তত্ত্বকে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বলা হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যতার উপরেই গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যদের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। (২) তাঁহারা শ্রুতির সমস্ত বাক্যকেই ভগবানের বাক্য বলিয়া মনে করেন এবং শ্রুতির সমস্ত বাক্যের উপর সমানভাবে আস্থাবান। সেইজন্য তাঁহারা শ্রুতির বিশেষ কোন বাক্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া অপর বাক্যটির প্রতি কম আস্থা প্রদর্শন করেন না। শ্রুতির মধ্যে কোন্‌টি প্রমাণ এবং কোন্‌টি প্রমাণাভাস তাহা মানুষের বুদ্ধির অগোচর—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।

প্রভু কহে শ্রুতির অর্থ বুঝিহে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
... ...
উপনিষদ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস-সূত্রে সব কয়॥
... ...
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥ (চৈ, চ, ৬ষ্ঠ পঃ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের মতবাদ এই তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কি ভাবে পৃথক পৃথক আকারে প্রকাশিত হয় এবং পৃথক পৃথক পদ দ্বারা অভিহিত হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় প্রথমনাথ তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম নামক গ্রন্থে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"একই সেই পরম তত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপ, বৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চারি প্রকারে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্তী তেজ যেমন মণ্ডল বহির্গত কিরণ এবং তাহার প্রতিচ্ছবি এই চারি প্রকারে অবস্থিত হয়, প্রকৃতস্থলে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই বিষ্ণুপুরাণেও অভিহিত হইয়াছে। যথা—এক দেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বিস্তারিণী হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তিও এই অখিল জগৎ স্বরূপে বিস্তার পাইয়া থাকে।

শ্রুতিও বলিয়া থাকে 'যাহার প্রভায় এই অখিল বিশ্ব প্রভান্বিত হয়' এইস্থলে সেই পরমতত্ত্বের ব্যাপকতাদি বশতঃ এইরূপ সমাবেশ উৎপন্ন হইতে পারে না, এই প্রকার শঙ্কা ও তাঁহার শক্তির অচিন্ত্যত্ব দ্বা[illegible]ই নিরাকৃত হইয়া থাকে। কারণ, দুর্ঘট ঘটকত্বই শক্তির অচিন্ত্যত্ব (৯১ পৃঃ)।"

এই শক্তি ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিকী অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য; ব্রহ্মের মধ্যে বা ব্রহ্মের সংশ্রবে [illegible]ত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। যেমন আগুনের দাহিকা শক্তির সহিত [illegible]'গুনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু আগুনে লোহা রাখার পর সাময়িক ভাবে [illegible]াতে যে দাহিকা শক্তি হয় তাহা লোহার পক্ষে অবিচ্ছেদ্য

শক্তি নয়, লোহার পক্ষে তাহা আগন্তুক শক্তি। কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন—

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ (চৈ, চ, আঃ ৪র্থ পঃ)

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবলমাত্র অত্যন্ত অভেদ তাহা বলা যেমন শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় তেমন শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বলাতেও শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধ ভাব হয়। এবং তর্কের দ্বারা নির্দ্দোষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান অসম্ভব বলিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ইহাকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে আমরা দেখিতে পাই "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরাঃ" (১।৩।২) অর্থাৎ যে জ্ঞান কোনও যুক্তি-তর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না অথচ উহার সত্যতা সম্বন্ধেও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না, তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞান। চিনি মিষ্টি লাগে, বিষ খাইলে মানুষ মারা যায়, কিন্তু চিনি কেন মিষ্টি লাগে অথবা বিষ খাইলে কেন মানুষ মরে তাহার কোন তর্ক বা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধেও অস্বীকার করা যায় না এবং চিনির মিষ্টত্ব শক্তি সমন্ধে যে জ্ঞান তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় অচিন্ত্যজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অচিন্ত্য শব্দের অর্থ তর্কসহ যে জ্ঞান তাহাই, অর্থাৎ কোন প্রসিদ্ধ কার্য্যের অন্যথা উপপত্তি না হওয়ারূপ যে অর্থাপত্তি প্রমাণ, সেই প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের যাহা গোচর তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান গোচর" (বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম, ৯৪, পৃঃ)। সেইরূপ শক্তি ও শক্তি-মানের মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহাও এইরূপ অচিন্ত্য ব্যাপার। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা যুগপৎ ভেদ ও অভেদ—কোনরূপ যুক্তি ও তর্কদ্বারা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হইলেও ইহার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ তাহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

সাধ্য সাধন তত্ত্ব—শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-লেখকগণের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে আমরা জানিতে পারি যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় এবং এই সাধ্যসাধন-তত্ত্ব

সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনায় মহাপ্রভু শ্রোতা এবং রায় রামানন্দ বক্তা।

পুরুষার্থ অর্থাৎ সাধ্য আমাদের কাম্য। এই পুরুষার্থ বলিতে আমরা বুঝি যে পুরুষ বা জীবের অর্থ বা কাম্যবস্তু। সাধারণ ভাবে সুখই আমাদের কাম্য বস্তু। কিন্তু রুচির পার্থক্য হেতু সুখ সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরকম নহে। যাঁহারা স্থুল ইন্দ্রিয়ের উপভোগকেই সুখ মনে করেন তাঁহাদের পুরুষার্থকে **কাম** বলা যায়। আবার যাহারা কেবলমাত্র স্থূল ইন্দ্রিয়-উপভোগই সুখ মনে করেন না কিন্তু সমাজ শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য করেন এবং প্রতিবেশীর সুখ সম্বন্ধে সচেতন তাহাদের পুরুষার্থ **অর্থ,** কারণ অর্থ ব্যতীত জনহিতকর কাজ করা অসম্ভব। উপরোক্ত দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের উপভোগ কেবলমাত্র ইহকালের; কিন্তু একদল লোক আছেন তাঁহারা ইহকালের সুখভোগেই তৃপ্ত হন না, তাঁহারা পরকাল বা স্বর্গাদি-সুখভোগও কামনা করেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অনুমোদিত **ধর্ম্ম**কেই পুরুষার্থ মনে করেন। কিন্তু গীতায় ভগবদ্‌বাক্য আছে যে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (৯,২১)। সুতরাং তাহাও ক্ষণিক সুখ এবং ইহাও ইন্দ্রিয় উপভোগের পর্য্যায়ভুক্ত। সেইজন্য এক শ্রেণীর সাধক এই তিন প্রকার সুখকে দেহাশ্রয়ী ও ক্ষণিক মনে করিয়া এইরূপ সুখ বা পুরুষার্থকে অনিত্য সুখের পর্য্যায়ে ফেলেন, কারণ দেহ যখন অনিত্য তখন দেহাশ্রয়ী সুখও অনিত্য হইবে। সেই জন্য তাঁহারা মায়ার বন্ধন ঘুচাইতে চেষ্টা করেন এবং এই বন্ধন ত্যাগের যে চেষ্টা তাহাই মুক্তি বা **মোক্ষ** এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহাই সুখ বা পুরুষার্থ। এই মোক্ষলাভ হইলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না এবং সংসারের যে দুঃখ তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ হয় এবং ইন্দ্রিয় বাসনার নিবৃত্তি হওয়ায় নিত্য চিন্ময়ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহাদিগকে **চতুর্ব্বর্গ** বলে। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রবৃত্তিমূলক এবং মোক্ষ নিবৃত্তিমূলক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মোক্ষকে চরম পুরুষার্থ স্বীকার করেন না। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উপরোক্ত চতুর্ব্বর্গকে অজ্ঞানতম কৈতব অর্থাৎ আত্মপ্রবঞ্চনা বলিয়াছেন; যথা—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ (চৈ, চ, আদি ১ম পঃ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলেন এই যে ব্রহ্মানন্দ ইহা লোভনীয় তাহা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা হইতেও লোভনীয় জিনিষ আছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির বিলাস নাই বলিয়া সেই আনন্দের বৈচিত্র্য নাই। শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন। রসের বিকাশ যত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্বাদন ততই লোভনীয় হইবে। শ্রীকৃষ্ণই রসের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের যে আস্বাদন তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ এবং অনেক বেশী লোভনীয়। অন্যের দূরের কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন—

(১) আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।

আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন (চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ)

(২) রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার

আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে। (চৈ, চ, মধ্য ২১তি পঃ)

শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় **প্রেম** এবং এই প্রেমকেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ পঞ্চম পুরুষার্থ বা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ গণ্য করিয়াছেন। যথা—

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।

কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ (চৈ, চ, আদি ৭ম পঃ)

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ব্রহ্মানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী যে অধিকতর লোভনীয় তাহার প্রমাণ কোথায় পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলেন যে শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতেই জানিতে পারা যায় যাঁহারা আত্মারাম অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্রহ্মানন্দময় পুরুষ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা যখন শোনেন তখন সেই মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া সেই মাধুর্য্য লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। যথা—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥ (ভাঃ ১৭।১০)

আমরা দেখিলাম যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কোনটাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হয় না। একমাত্র পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমেরই পুরুষার্থতা আছে, সুতরাং প্রেমই হইল মুখ্যসাধ্য

বস্তু। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর কথোপকথনের ভিতর দিয়া এই সাধ্য বস্তুটির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। রামানন্দ প্রথমে বলিলেন "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়।" কিন্তু ইহা পুরুষার্থ নহে কারণ দেহাবেশের জন্য ইহা পরম ধর্ম্ম নহে। সেইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" রামানন্দ ইহার পরে বলিলেন "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।" ইহারও পুরুষার্থতা নাই, যেহেতু ইহাও দেহাবেশ। ইহাতে কেবলমাত্র কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা থাকে, সেইজন্য শ্রীচৈতন্য বলিলেন "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" রায় তারপর 'স্বধর্ম্মত্যাগ' সম্বন্ধে বলিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ইহাকেও "বাহ্য" বলিলেন। কারণ এই স্বধর্ম্ম-ত্যাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিবশতঃ নহে, ইহা ভগবদ্‌বাক্য "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" পালন করা মাত্র। ইহাতেও দেহ-বুদ্ধি আছে, যেহেতু ভগবদ্‌বাক্য পালন করিলে পাপ প্রভৃতির ভয় থাকে না। ইহার পরে রায় রামানন্দ "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি"র কথা বলিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্য বলিলেন, কারণ এইরূপ জ্ঞানতত্ত্ব-আলোচনার জন্য মনকে ব্যাকুল করে। তত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে মোহগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং তাহা সাধনার পক্ষে বিঘ্নজনক। এইরূপ তত্ত্ব আলোচনা করিলে ভগবানের সহিত জীবের যে সেব্য ও সেবক সম্বন্ধ সেই অনুভূতি ক্ষীণ হইয়া আসে। রামানন্দ ইহার পরে "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির"(অর্থাৎ ভগবানের কোন তত্ত্ব না জানিয়াও তাঁহার প্রতি যে ভক্তি) উল্লেখ করিলেন। রায় রামানন্দ এই প্রসঙ্গে ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞানশূন্যা ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সেই ব্যাখ্যা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভগবান কি তত্ত্ব তাহা না জানিলেও, এবং তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র সাধু-সজ্জনদিগের নিকট তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি যে ভক্তি, তাহাই জ্ঞান-শূন্যা ভক্তি। তখন মহাপ্রভু বলিলেন "এহো হয় আগে কহ আর।" রামানন্দ তখন বলিলেন "প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার" কারণ ভগবান শুধু প্রেমই চান; প্রেমবিহীন নানা উপচারের পূজা তিনি গ্রহণ করেন না। প্রভু ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর শুনিতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন। রায় রামানন্দ তখন বলিলেন যে "দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" কিন্তু ইহাতেও প্রভু বলিলেন "এহো হয়, আগে কহ আর।" কারণ দাস্যভাবে সেবা করিলে মাঝে মাঝে এইরূপ সঙ্কোচ হইতে পারে যে তাহাদের সেবায় হয়ত কোন ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে এবং

শ্রীকৃষ্ণও সেই সেবায় যেন প্রাণ মাতানো আনন্দ পাইতেছেন না। ইহার পর রামানন্দ বলিলেন "সখ্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার"। সখারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন ও তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সখাদের সেবা করিতেছেন ও তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখাদের ব্যবহারে কোন সঙ্কোচ নাই, দাস্যপ্রেমে এই মাখামাখির ভাব অবর্ত্তমান। সখারা প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করার জন্য শ্রীচৈতন্য এই সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেন। কারণ—

আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥ (চৈ, চ, আঃ ৪র্থ পঃ)

কিন্তু ইহা শুনিয়াও মহাপ্রভুর তৃপ্তি হইল না, তিনি ইহা হইতেও উত্তম জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন রায় রামানন্দ বলিলেন "বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" প্রভু ইহাও উত্তম বলিলেন। কেননা বাৎসল্য প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে আরও আপনার বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদা ও নন্দের যে মমতাবোধ তাহা সখাদের নাই। কিন্তু মহাপ্রভু যে প্রেমের কাঙ্গাল, যে মধুর প্রেম জগতে প্রচার করিবেন তাহা বাৎসল্য প্রেমেরও ঊর্দ্ধে, সেইজন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শেষ হইল না। তিনি রামানন্দকে বলিলেন "এহোত্তম আগে কহ আর"। তখন রামানন্দ বলিলেন "কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" কারণ—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ (চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ)

রামানন্দ রায় ইহার পরে এই কান্তা প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহার পূর্ব্বে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা প্রেমের পরিকর ব্রজেও আছে এবং মথুরা-দ্বারকাতেও আছে। মথুরা-দ্বারকাতে পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় তাঁহাদের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা প্রেমের সঙ্কোচ হইয়াছিল—তাঁহাদের যে প্রীতির অভাব ছিল তাহা নহে, কিন্তু প্রীতির আবরণের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রচ্ছন্ন ছিল। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া যে প্রীতি তাহা শ্রেষ্ঠ নয়, কারণ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত" (চৈ, চ, আদি, ৪র্থ পঃ)। কিন্তু ব্রজে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিকর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ বলিয়াই জানেন,

কারণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকে নরলীলা বলা হয়। ব্রজের পরিকরদের প্রেম এত গাঢ় যে ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। কিন্তু সে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ কেবলমাত্র মাধুর্য্যের মধ্য দিয়াই। সেইজন্য রামানন্দ রায় ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা প্রেমের কথাই বলিয়াছেন, দ্বারকা-মথুরার নহে। কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া রামানন্দ রায় তাহার ব্যাখ্যা হিসাবে বলিলেন—

যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥ (চৈ, চ, মধ্য.৮ম পঃ)

শ্রীচৈতন্য ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয।" কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে এবং উহার উপরেও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। রায় রামানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কি তাহা জানিতে চাহে এমন লোক তাঁহার জানা ছিল না; উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন যে কান্তা প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার হইলেও রাধিকার প্রেম "সাধ্য শিরোমণি"। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে রাধিকার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। সাধ্য কি আমরা তাহা জানিতে পারিলাম। এইবার রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব ও রাধিকাতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আবার 'সাধন' সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রসতত্ত্ব—'রস' বলিতে আমরা সাধারণত আনন্দ মনে করি। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্মের আনন্দ চেতন-স্বরূপ, সেইজন্য তিনি আনন্দের বৈচিত্র্য আস্বাদন করিতে পারেন। উপনিষদে ব্রহ্মকে রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে—রসো বৈ সঃ (তৈত্তিঃ উঃ ২।৭)। রস কথার দুইটি অর্থ হইতে পারে; প্রথম অর্থ রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদ্য তাহাও রস এবং যে আস্বাদন করে তাহাও রস। রস শাস্ত্র অনুসারে যাহার চমৎকারিত্ব আছে তাহাই রসের প্রাণ; কিন্তু শুধু চমৎকারিত্ব থাকিলেও চলিবে না সেই চমৎকারিত্ব আবার অপূর্ব্ব হওয়া দরকার। যে বস্তুর আস্বাদনে প্রতিক্ষণে চমৎকারিত্ব আছে, যাহা আস্বাদন করিলে কখনও বিতৃষ্ণা না জন্মিয়া আস্বাদন করিবার আকাঙ্ক্ষা বেশী হয় তাহাকেই আস্বাদ্য রস বলে। আবার উক্তপ্রকার রস আস্বাদন করিয়া যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন মাধুর্য্য অনুভব করেন এবং আস্বাদনের স্পৃহা কেবল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে তাহাকে আস্বাদক রস বা রসিক বলা হয়।

কাব্য বা অপর প্রাকৃত বস্তু হইতে যে রস পাওয়া যায় তাহা অনিত্য, সেইজন্য তাহাতে নিয়ত চমৎকারিত্ব ও নিয়ত মাধুর্য্যের আস্বাদ থাকিতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মেই এই রসের পূর্ণত্ব এবং পূর্ণ বিকাশ। ব্রহ্মের স্বাভাবিক স্বরূপ শক্তি একরূপে এই আনন্দকে আস্বাদ্য করে এবং অন্যরূপে এই আনন্দকে আস্বাদক করে; এবং উভয়রূপেই এই আনন্দের এবং নিজেরও বৈচিত্রী সম্পাদন করে। অনাদিকাল হইতে শক্তিসহ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম রসরূপে বিরাজিত। ব্রহ্ম ও রস অভিন্ন।

অলঙ্কার শাস্ত্রে আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত এই নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে এই নয় প্রকার রস গৌণ এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটি রস প্রধান। এখানে রস অর্থে আস্বাদ্য বুঝায় কিন্তু এই আস্বাদন প্রাকৃত বস্তুর নহে, কারণ একমাত্র আস্বাদ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই সকল রসের মধ্যে আবার শৃঙ্গার বা মধুর বা উজ্জ্বল রস প্রধান—

নরমেব শ্যাম রূপং
পুরী মাধুপুরী বরা
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেযং
অদ্যো এব পরো রসঃ।

প্রেমতত্ত্ব—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রেমকে প্রাকৃত মনের একটি বৃত্তি বলিয়া মনে করেন না। ভগবানের কৃপালাভ করিয়া ভক্তের মনে মোক্ষ বাসনা লোপ পাইলে তখনই তাহার চিত্তে শুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহাই ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে। এই প্রেমের সহিত নিজের ইন্দ্রিয় সম্ভোগের কোন সম্পর্ক নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম। কবিরাজ গোস্বামী প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য—হয় প্রেম প্রবল॥ (চৈ, চ, আঃ ৪র্থ পঃ)

এই প্রেমের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণকে আর ঈশ্বর বলিয়া মনে হয় না, পরম আত্মীয় বলিয়াই মনে হয়। প্রেম যতই গাঢ় হয় শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি ততই বেশী হইয়া থাকে। প্রেমের পরিণতি সম্বন্ধে অলঙ্কারের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গোপীতত্ত্ব—গুপ্ ধাতু হইতে গোপী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা; যে সমস্ত রমণীগণ মহাভাব রক্ষা করেন তাহারাই গোপী। (৩) বহু কান্তা ব্যতীত কান্তা রস-বৈচিত্রীর আস্বাদ হয় না, সেজন্য অসংখ্য গোপীর প্রয়োজন। গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা, যথা

আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ (চৈ, চ, আদি, ৪র্থ পঃ)

শ্রীরাধা প্রেম-কল্পলতা-সদৃশ আর ব্রজদেবীষণ তাঁহার শাখাপত্র তুল্য—

রাধার স্বরূপ-কৃষ্ণ প্রেমলতা।
সখিগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প পাতা॥ (চৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ)

গোপীগণ রাধিকার সখী এবং এই সখীদ্বারাই রাধা-কৃষ্ণের লীলা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। রাধিকার কাছে তাঁহাদের গোপন করিবার কিছুই নাই এবং রাধিকাও তাহাদের কাছে কিছু গোপন করেন না। কারণ তাঁহারা রাধিকার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় সখা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিবার বাসনা তাঁহাদের নাই। রাধা ও কৃষ্ণের যে কেলি তাহাতেই তাঁহাদের অধিক আনন্দ—

সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখালীলা বিস্তারিযা সখী আস্বাদয॥
... ...
সখীর স্বভাব এক একথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায নাই সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার যে লীলা করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায॥ (চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ)

গোপীদের একমাত্র কাম্য শ্রীকৃষ্ণের সুখের সাধন। তাঁহাদের বেশ ভুষা প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য, নিজেদের জন্য নহে।

কৃষ্ণ সেবা সুখপুর সঙ্গম হইতে সুমধুর (চৈ, চ, অন্ত্য, ২০ম পঃ)

গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধে অলঙ্কারের অধ্যায়ে সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থারতি দ্রষ্টব্য।

রাধাতত্ত্ব--অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব আলোচনা করিবার সময আমরা দেখিয়াছি যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অদ্বয়তত্ত্বের সহিত তাহার শক্তির

ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করেন। পরম অদ্বয় তত্ত্বের শক্তি তিন প্রকার : অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। অন্তরঙ্গা শক্তির আর একটি নাম স্বরূপ শক্তি ; এই শক্তির দ্বারা ভগবান স্বয়ং পূর্ণস্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপ বৈভবরূপে অবস্থান বরেন ; তটস্থা শক্তিরূপে শুদ্ধজীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরঙ্গ অর্থাৎ মায়া শক্তির দ্বারা জড়াত্মক প্রধানাদিতে বাস করেন। অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি আবার তিন প্রকার ভাবে বিভক্ত. ভগবান যে শক্তির দ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও অপর সকল বস্তুকেও ধারণ করান সেই শক্তির নাম সন্ধিনী। সেইরূপ ভগবান স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানের আশ্রয় হয়েন এবং জীবসমূহকেও জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া থাকেন সেই শক্তির নাম সম্বিৎ। ভগবান স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা স্বরূপভূত আনন্দের স্বয়ং অনুভব করেন ও অপর সকলকে অনুভব করান, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম এবং প্রেমের পরম সার মাদন নামক মহাভাব। রাধা এই মাদন নামক মহাভাব স্বরূপিনী :—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি,—জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি—সভার উপরে॥
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
'কৃষ্ণকে আহ্লাদে,—তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ—তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময় রস—প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার—মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপ রাধা ঠাকুরাণী॥ (চৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ)

অভেদ রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা একই স্বরূপ ; অনাদি কাল হইতে কেবলমাত্র লীলারস আস্বাদনের জন্যই ভিন্ন স্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ (চৈ, চ, আদি, ৪র্থ পঃ)

রাধিকা মূল কান্তা শক্তি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। রাধিকা কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণ ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। তিনি সদা সর্ব্বদা নয়নে কৃষ্ণরূপ দেখেন তাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ কথা, তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণ-গাত্র-গন্ধ অনুভব করেন এবং তাঁহার শ্রবণে সর্ব্বদা কৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি প্রবেশ করে। তিনিই কৃষ্ণকে শ্যামমধু রস পান করান এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের আকর—

কৃষ্ণকে করায় শ্যাম মধুরস পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর॥ (চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ)

রাধিকা কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে (চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ)। শ্রীকৃষ্ণ জগতকে মোহিত করেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধিকার দ্বারা মোহিত হন এবং তিনি সমস্তের পরাঠাকুরাণী—

জগত মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী
অতএব সমস্তের পরাঠাকুরাণী॥ (চৈ, চ, আদি ৪র্থ পঃ)

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তির, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের ও সমস্ত মাধুর্য্যের আধার এবং তিনি পূর্ণতত্ত্ব কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রেমে উন্মত্ত এবং ব্রজদেবীর সাহচর্য্যে তাঁহার মাধুর্য্যের বৃদ্ধি হয়—

পূর্ণানন্দময় আমি, চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥

রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি-শিষ্য-নট।
সদা আমা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ (চৈ, চ, আদি ৪র্থ পঃ)

রাধা কৃষ্ণের প্রেম-বিলাস সম্বন্ধে রায়› রামানন্দ তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত গীত মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন। দুহুঁ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুহুঁ ভেল দূতী। সু-পুরুখ প্রেম ঐছন রীতি॥

দুই জনের দেহ ও মনের যখন অভিন্নতা বোধ জন্মে তখনই প্রকৃত প্রেম জন্মে এবং মহাভাব না হইলে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে না। শ্রীরাধা স্বয়ং মহাভাব স্বরূপা সেই জন্য তাঁহার ও শ্রীকৃষ্ণের যে বিলাস তাহাতেই পুরুষ বা রমণী এই প্রকার ভেদ-বোধ থাকে না, উভয়ে একান্ত হইয়া যান।

গোপীগণের তথা রাধিকার যে প্রেম সেই প্রেমের প্রতিদান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও দিতে পারেন না। তিনি সেজন্য তাঁহাদের কাছে ঋণী,

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥ (চৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ)

ভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

ভাঃ ১০।৩২।২২

(অর্থাৎ দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল সকল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তোমরা আমার ভজনা করিয়াছ। আমার সহিত তোমাদের যে মিলন তাহা অনিন্দ্য। দেব পরিমিত আয়ু পাইলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার হউক)।

রাধার প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিকাশ হয়, রাধিকা যখন কৃষ্ণের পাশে থাকেন তখন শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য হয় তাহাতে স্বয়ং মদনও মোহিত হন, অন্যথায় তিনি মদনের দ্বারা মোহিত হন,—

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন মোহন।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদন-মোহিত ॥
(গোবিন্দ লীলামৃত ৮।৩২)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাধাপ্রেমই সর্ব্বসাধ্য শিরোমণি। সাধ্যতত্ত্ব জানিতে পারিয়া এইবার আমরা 'সাধন' কি তাহা আলোচনা করিব। এই যে সাধ্যবস্তু তাহা সাধন ব্যতীত লাভ করা যায় না। জীবের পক্ষে সাধ্য শিরোমণি লাভ করা অসম্ভব। রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি, কিন্তু তাহা সাধনের ফল নহে—অনাদিকাল হইতেই তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে জীবের পক্ষে রাধাপ্রেমের আনুগত্যময় প্রেমলাভ করা সম্ভবপর। এবং তাহাই 'সাধন' করিয়া লাভ করিতে হইবে। লীলা প্রসঙ্গে রাধাপ্রেমের বিকাশ হয় এবং রাধাপ্রেমের আনুগত্যময় প্রেমের অবকাশও কেবলমাত্র লীলাতে। কিন্তু সখীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও লীলায় অধিকার নাই। সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রাধার সখীস্থানীয়া গোপীগণের ন্যায় সহজ সরল ভাবে তনু, মন, প্রাণ ঢালিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই সখীভাব। এই সখীভাবে সাধন করিলে সাধ্য শিরোমণি রাধাপ্রেমের অনুগত প্রেমলাভ করা যায়। এইরূপ 'সাধন'কে রাগানুগা ভজনা বলে। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবার লোভেই এইরূপ সাধন আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতন থাকা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ সাধন হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত আপনার মনে করিবার পর এইরূপ ভজন বা সাধন আরম্ভ হয় এবং দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের আনুগত্যময়ী সেবার অনুকূল ভজনও অনেকে করিয়া থাকেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এই সাধন ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামীকে এই সাধন ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন এবং ইহা সনাতন শিক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত শিক্ষা প্রদান কালে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে চৌষট্টি অঙ্গ সাধন ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা প্রভৃতি প্রথম দশটি গ্রহণীয় এবং ইহার পরে সেবানামাপরাধ, অবৈষ্ণবসঙ্গ প্রভৃতি দশটি বর্জ্জনীয়; এবং ইহার পরের শ্রবণ, কীর্ত্তন, প্রভৃতি চুয়াল্লিশটি অঙ্গ ভক্তির উন্মেষ-সাধক। ইহাদের মধ্যে আবার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য

ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি নয়টি উক্ত চুয়াল্লিশ অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উক্ত চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে আবার সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তি সেবা এই পঞ্চ অঙ্গকেই মহাপ্রভু সাধনশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার নামকীর্ত্তন পরম উপায় বলিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

[হে ভগবান, তুমি নামের মধ্যে তোমার সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং 'নাম' গ্রহণেরও কোন কাল নির্দ্দেশ কর নাই ; তোমার এইরূপ করুণা সত্ত্বেও আমি এমনই দৈব দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত যে, তোমার নাম গ্রহণে অনুরাগ জন্মিল না।] কবিরাজ গোস্বামী বলিযাছেন—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
... ...
নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥
... ...
খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিযম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয॥ (চৈ, চ, অন্ত্য, ২০শ পঃ)

বৈধী ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মহিমাব জ্ঞানই প্রধান হয়, কিন্তু এইরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যিনি ভাগ্যবান তাঁহার শুদ্ধা ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লোভ জন্মিবে এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সেইরূপ অবস্থায় যখন সাধক উপস্থিত হইবেন তখন তাঁহার ভক্তি রাগানুগায় পরিবর্ত্তিত হইবে। সনাতন শিক্ষায় রাগানুগভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, ইষ্ট বস্তু সম্বন্ধে প্রগাঢ় তৃষ্ণা ও অনুরাগ এবং ইষ্টবস্তুর প্রতি আবিষ্টতা লইয়া যে ভক্তি তাহাকেই রাগানুগা ভক্তি বলে ; রাগানুগা ভক্তির অন্য লক্ষণ এই যে তাহা শাস্ত্রের যুক্তি মানে না এবং ইহার সাধন দুই রকম 'বাহ্য' ও 'অন্তর'। নিজেকে সিদ্ধদেহ ভাবিয়া রাত্রিদিন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই ইহার লক্ষণ।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ—স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসি ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভিষ্ট-কৃষ্ণ-শ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর করে সেবা অন্তর্মনা হঞা॥ (চৈ, চঃ মধ্য ২২ পঃ)

রাগানুগার সাধন দুই প্রকার,—বাহ্য সাধন বা দেহের সাধন এবং অন্তর বা মানসিক সাধন। বাহ্য সাধন বলিতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দনা, পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান বুঝায়। মানসিক সাধন বলিতে নিজেকে সিদ্ধ মনে করিয়া অনুক্ষণ অখিল রসামৃত শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও চিন্তা বুঝায়। মনুষ্যদেহ জড় এবং প্রাকৃত কিন্তু ভগবান চিন্ময় এবং অপ্রাকৃত, সুতরাং এই জড় দেহ লইয়া ভগবানের প্রকৃত সেবা করা চলে না। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে সেবা করাই একমাত্র কাম্য; সেইজন্য সাধনার দ্বারা ভক্ত এমন একটি অপ্রাকৃত দেহ লাভের ইচ্ছা করেন যাহার দ্বারা তিনি সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সেবা করিতে পারেন। এইরূপ দেহকেই সিদ্ধ দেহ বলে।

মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত প্রেম ধর্ম্মমতে যে রসসম্পাত দেখিতে পাই তাহা অভিনব। শাণ্ডিল্য সূত্র ও নারদ পাঞ্চরাত্র হইতে আমরা নিশ্চয় ভাবে জানিতে পারি যে ভক্তিধর্ম্ম ভারতে অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। গীতা হইতেও আমরা ভক্তিধর্ম্মের কথা জানিতে পারি। কিন্তু উহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীতা, ১০, ১০)

[যে সকল ব্যক্তি আমাকে প্রাণ, মন সমর্পন করেন, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করেন] কিন্তু মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহা অহৈতুকী ভক্তির-উপর প্রতিষ্ঠিত;

শ্রীচৈতন্য নূতন প্রণালীতে সাধ্য নির্ণয় করিলেন এবং রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া যে অপূর্ব্ব প্রেম ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার নিজস্ব, যদিও দাক্ষিণাত্যের কর্ণামৃত ও আলবার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

মাধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মতবাদের সহিত মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত মতবাদের সামঞ্জস্য থাকায় উভয় মতবাদ অভিন্ন বলিযা কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু মাধ্বাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজসুখানুভূতি রূপ মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহাপ্রভু যে মতবাদ প্রচার করেন তাহাতে প্রেমই হইতেছে পরম পুরুষার্থ। মাধ্বমতে বিশুদ্ধ ভক্তিই সাধন কিন্তু মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মতবাদে গোপীভাবে বিশেষ করিয়া রাধা ভাবের ভজনই প্রকৃত সাধন। মাধ্বাচার্য্য বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মনে করেন, মহাপ্রভু যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা ভাগবত পুরাণের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশালী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করিব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে ভগবত্তার কল্পনা করা হইযাছে তিনি প্রেমের ঠাকুর, প্রেমের মূল্যে তাহাকে পাওযা যায। তিনি ভযাল নন বা পাপীব শাস্তিদাতা নন। তাঁহার মাধুর্য্য অসীম ও বর্ণনার অতীত হইলেও ইহাই জীবকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করে। এ ধর্ম্মমতে যে ভগবত্তাব কল্পনা করা হইযাছে তিনি আমাদের অত্যন্ত আপনার এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয। আমাদের উদ্ধার করাই তাঁহার স্বভাব ধর্ম্ম এবং তাঁহাকে যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি সেই জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা নাই। জাতি কুল নির্ব্বিশেষে সকলেই এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং ভজন করাইবারও অধিকার আছে—

> যেই ভজে সেই বড, অভক্ত হীন ছাড়।
> কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ (চৈ, চ, অন্ত্য, ৪র্থ পঃ)
> কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়।
> যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ (চৈ, চ, মধ্য ৮ম পঃ)

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রমাণ পঞ্জী

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ পৃঃ ৩১০
(২) ঐ ঐ ঐ
(৩) বৈষ্ণব রস সাহিত্য —শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র পৃঃ ১৩-২২

পঞ্চম অধ্যায় — বৈষ্ণব রসতত্ত্ব

রসতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্ত অনুসারে অখিলরসামৃত শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাই একমাত্র রস এবং তাহা অপ্রাকৃত এবং ইহাও বলিয়াছি যে মধুর বা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রসই সর্ব্বপ্রধান। এই যে মধুর রতি তাহা আস্বাদন করিবার জন্য সহকারী ভাবের প্রয়োজন। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ও সঞ্চারি প্রভৃতি সহকারি ভাব দ্বারা মধুর রতি যদি আস্বাদন করা যায় তবে তাহাই প্রকৃত মধুর রতি বলিয়া ধরা হয়।

বিভাব—রতি-বিষয়ক আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার (১) আলম্বন বা আবলম্বন (২) উদ্দীপন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে আলম্বন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াগণ; কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকেও আলম্বন বিবেচনা করেন। আলম্বনরূপ শ্রীকৃষ্ণের বহু গুণরাশির মধ্যে কয়েকটির নাম হইল,—সুধী, সপ্রতিভ, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর সুখবান, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেম-প্রচুর, গাম্ভীর্য্য-সমুদ্র, কীর্ত্তিমান, নারীর মোহন, অতুল্য, বংশীধর। শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ গুণের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বলিয়াছি। এখন আমরা নায়ক, নায়িকা, যূথেশ্বরী, দূতী, সখী, হরিবল্লভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিব,—ইহারা সকলেই আলম্বনের পর্য্যায়ে পড়েন। উদ্দীপন সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

নায়ক চারি প্রকার (১) ধীরললিত—বিদগ্ধ, নবযুবা, পরিহাস-বিশারদ ও নিশ্চিন্ত নায়ককে ধীরললিত বলা হয়। ইনি প্রায়ই প্রেয়সীর প্রেমানুসারে বশবর্ত্তী হন, যথা কন্দর্প। (২) ধীরশান্ত—শান্ত স্বভাব, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক এবং বিনয়ী নায়ককে ধীরশান্ত নায়ক বলা হয়, যথা যুধিষ্ঠির। (৩) ধীরোদ্ধত —অন্য শুভদ্বেষী, অহঙ্কারী, মায়াবী, কোপনস্বভাব, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাকারী নায়ককে ধীরোদ্ধত নায়ক বলা হয়, যথা মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। (৪) ধীরোদাত্ত—গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, দয়ালু, সুদৃঢ়ব্রত, শ্লাঘারহিত, গূঢ়গর্ব্ব, এবং বলবিশেষসম্পন্নকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলে, যথা শ্রীকৃষ্ণ। এই চারি প্রকার নায়ক আবার (১) পতি ও (২) উপপতি ভাবে বিভক্ত হয়। শাস্ত্র-মতে বিবাহ হইলে তাহাকে পতি বলে। আর ইহলোক পরলোক গণ্য না

করিয়া অনুরাগের বশবর্তী হইয়া যে পরস্ত্রী বা অন্য নারীর সহিত বিহার করে তাহাকে উপপতি বলা হয়। মহামুনি ভরত উপপতির শৃঙ্গারকে শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া মনে করিযাছেন। যদিও ভরত প্রভৃতি আলঙ্কারিকদের মতে ইহাই শ্রেষ্ঠ তথাপি সমাজ ও নীতির দিক হইতে বিচার করিলে ইহার কোন মূল্য নাই এবং ইহা নিন্দনীয়। কারণ ইহা পুরুষ ও নারীর কামুকতা ছাড়া আর কিছুই নহে সুতরাং এই উপপতি প্রাকৃত জনের পক্ষে নিন্দনীয় এবং বর্জ্জনীয়। কিন্তু অখিল রসামৃত শ্রীকৃষ্ণ এই মধুররস আস্বাদনের জন্যই বৃন্দাবনে মনুষ্যলীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কামগন্ধশূন্য তাই সেই নায়কশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বরসাধারের পক্ষে পরকীযা প্রেম নিন্দনীয় হইতে পারে না।

পতি ও উপপতি আবার চারিপ্রকার (১) অনুকূল (২) দক্ষিণ (৩) শঠ আর (৪) ধৃষ্ট। নাট্যশাস্ত্রে শঠ ও ধৃষ্ট নায়কের উল্লেখ আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কোন ভাবই অযুক্ত নহে,কারণ তাঁহাতে সমস্ত প্রকার ভাবই সম্ভবপর। যে নাযক কেবলমাত্র এক নারীতেই অনুরক্ত থাকে কিন্তু অন্য কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয না তাহাকে অনুকূল নায়ক বলা হয। যেমন সীতার প্রতি রাম ও শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ। উদাহরণ স্বরূপ নিম্ন পদাংশটি দেওয়া গেল :—

রাই তুহু সে জানসি রস।

সকলের কাছে	যেমন তেমন	হরি সে তোমারি বশ॥
যখন তোমারে	না দেখে নাগর	কাতর হইয়া রহে।
কত না যুবতী	লালসা করযে	ফিরিয়া নাহিক চাহে॥
যত গুণবতী	আছয়ে যুবতী	তুহু তার শিরোমণি।
তোমারে ছাড়িতে	না পারে যেমন	ফণি না ছাড়যে মণি॥

(উজ্জ্বল চন্দ্রিকা)

অনুকূল নায়ক আবার চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—

(১) ধীরোদাত্তানুকূল (২) ধীরললিতানুকূল (৩) ধীরশান্তানুকূল ও (৪) ধীরোদ্ধতানুকূল।

যে নায়ক অগ্রে এক নারীতে আসক্ত হইয়া কদাচিৎ যদি অন্য নারীর প্রতি অনুরাগী হয় কিন্তু পূর্ব্ব-প্রণয়িনীর গৌরব, ভয় ও দাক্ষিণ্যাদি পরিত্যাগ করে না তাহাকে দক্ষিণ বলা হয়। অনেক নারীতে যে নায়কের সমভাব সেইরূপ নায়ককেও অনেকে দক্ষিণ বলিয়া থাকেন।

যে নায়ক প্রিয়ার সম্মুখে তাহার প্রতি প্রিয়ভাষী হইয়া পরোক্ষে নিন্দা করে এবং প্রিয়তমার প্রতি বহু অপরাধ করে তাহাকে শঠ বলা হয়।

অন্য যুবতীর ভোগ চিহ্নসকল প্রকাশ পাইলেও যে নায়ক প্রিয়ার সম্মুখে নির্ভয় হইয়া থাকে এবং প্রিয়ার সম্মুখে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত তাহাকে ধৃষ্ট বলা হয়। যথা (খণ্ডিতা শ্যামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)—

কাঁহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহু সুন্দরী এ নব কুসুম দেহ।
কাজর ভরমে মরমে কাহে গঞ্জসি মৃগমদ পদ পুন এহ॥
সুন্দরি, মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখ দোখ বিনু মানসি দিনহি তরুণ দিঠি মন্দ॥

(উ, চ)

সংক্ষেপে বলিতে গেলে নায়ক ৯৬ প্রকার—ধীরোদাত্ত+ধীরললিত+ধীরশান্ত+ধীরোদ্ধত=৪; ৪×৩ (পূর্ণ+পূর্ণতর+পূর্ণতম)=১২; ১২×২ (পতি+উপপতি)=২৪; ২৪×৪ (অনুকূল+দক্ষিণ+শঠ+ধৃষ্ট)=৯৬।

সখা—পরিহাস করিতে পটু, নায়কের প্রতি সর্ব্বদা গাঢ় অনুরক্ত, দেশ ও কালে অভিজ্ঞ এবং গোপীগণের কষ্ট হইলে তাঁহাদের প্রসন্ন করিবার জন্য যাহারা মন্ত্রণা দিতে পটু তাঁহারাই সখা পদবাচ্য হ'ন। এইরূপ সখা পাঁচ-ভাগে বিভক্ত, যথা—

(১) চেটক—যে সখা সন্ধান বিষয়ে চতুর, যে গুপ্তভাবে কর্ম্ম করিতে পারে এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাকে চেটক বলা হয়—গোকুলে ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীকৃষ্ণের চেটক সখা ছিলেন।

(২) বিট—যে সখা বেশ রচনা ও শুশ্রূষা করিতে দক্ষ, যিনি ধূর্ত্ত এবং যিনি স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্রে অভিজ্ঞ হন তাঁহাকেই বিট বলা হয়। কড়ার, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কয়েকজন গোপ শ্রীকৃষ্ণের বিট সখা ছিলেন।

(৩) বিদূষক—যে সখা ভোজনে অতিশয় লোলুপ, কলহ-প্রিয়, এবং বেশ, দেহ বিকৃত করিয়া হাস্য রসের সৃষ্টি করেন তাঁহাকে বিদূষক বলা হয়। "বিদগ্ধমাধব" নাটকে মধুমঙ্গল এবং বসন্তাদি গোপগণও শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক সখা।

(৪) পীঠমর্দ্দ—যিনি নায়ক তুল্য গুণবান হইয়া সেই নায়কেরই অনুবৃত্তি-কারী হন তাঁহাকে পীঠমর্দ্দ বলা হয়। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের পীঠমর্দ্দ সখা।

(৫) প্রিয়নর্ম্ম সখা—যিনি নায়কের সমস্ত রহস্য জানেন এবং যাঁহার

ভিতর সখিভাব আছে এবং যিনি নায়কের প্রণয়ীদের প্রিয় তাঁহাকে প্রিয়নর্ম্ম সখা বলা হয়। যেমন গোকুলে সুবল এবং দ্বারকায় অর্জ্জুন ;—

সখি, সুবল বড় পুণ্যবান।

কুঞ্জকি মাঝে শেজবর করতহি মনসিজ কেলি বিথান॥
হরি যব রাইক হৃদয় পরি সুতই অলস বলিত সব অঙ্গ।
রতি রণ ছোড়ি থির নহি পাওত ঢর ঢর ঘরম তরঙ্গ॥
তৈখনে যাই সুবল নব পল্লবে বিজই নাগর রাজে।
ঐছন সেবন নিতি নিতি করতহি সুবল নিকুঞ্জ মাঝে॥ (উ, চ)

দূতী—দূতী সাধারণত নায়িকার সহায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে নায়কের গুণ প্রকাশ করিয়া পরোক্ষে নায়কেরও সহায়তা করে; শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি স্বয়ং দৌত্য। বিশাখা শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষের গুণ বর্ণনা করিয়া পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য করিতেছে। যথা—

শুন সখি মাধব নয়ন তরঙ্গ আপহি করতহি দূতিক রঙ্গ॥
যাকর উপর আসি পহু মিলে তবহি বজর পরে তাকর কুলে॥
আন রহু দূর, তুহু ধীর বরনারী চঞ্চল হোয়ল চরিত তোহারি॥ (উ, চ)

বীরা ও বৃন্দা নামা শ্রীমতীর সখীকে কৃষ্ণের আপ্ত, অর্থাৎ, আপন দূতি বলা হয়। শ্রীরাধিকা মান করিলে বীরা শ্রীরাধিকার প্রতি যাহা বলিলেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল। বীরার উক্তি প্রগলভতাযুক্ত এবং তিনি পরোক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই দৌত্য করিলেন :—

ন কুরু গরব সুন্দরী মঝু বচনে। হরি সনে কলহ করিল ধিক জীবনে॥
গিরি ধরি রাখিল এ ব্রজ ভুবনে তরিতহি মিলহ তাকর চরণে॥ (উ, চ)

মানিনী শ্রীরাধিকাকে চাটুবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুকূল করিতে চেষ্টা করিয়া বৃন্দা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য করিলেন। যথা—

বৃন্দা হাম নাম বিনয় করই কত পুন পুন প্রণমহি চরণে।
এ মঝু বচনে বচন দেহ সুন্দরী ফিরি চাহ খঞ্জন নয়নে॥
রাই তুহা ভুরু ভুজঙ্গিনী ভ্রমণে।
অতিশয় মান বিষম বিষ দাহনে জারল কালীয় দমনে॥
নাগর চিত ভীত অতি আকুল ব্রজ ছাড়ি ফিরই গহনে।
ছোড়ই দোখ রোখ সব সম্বর শীতল জল দেহ দহনে॥ (উ, চ)

বীরা ও বৃন্দা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলে দৌত্য করেন।

হরিবল্লভা—যে সমস্ত নায়িকা হরির সমান গুণযুক্ত এবং যাহারা প্রেম ও মাধুর্য্য রসে পরিপূর্ণ তাঁহারা হরিপ্রিয়া বা হরিবল্লভা নামে প্রসিদ্ধ—

হরেঃ সাধারণ গুণৈরুপেতাস্তস্য বল্লভাঃ।
পৃথু প্রেম্নাং সুমাধুর্য্য সম্পদাঞ্চাগ্রিমাশ্রয়ঃ ॥১॥ উ, নী,৩য় অধ্যায়

তাঁহাদের আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) স্বকীয়া ও (২) পরকীয়া। শাস্ত্রমতে বিবাহ হইয়া যাঁহারা পতির আজ্ঞাকারিণী ও পতিব্রতা ধর্ম্ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করেন তাঁহারাই স্বকীয়া। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত আট (১৬১০৮) জন মহিষী ছিলেন ; তাঁহাদের স্বকীয়া বলা হয়। এই মহিষীগণের মধ্যে (১) রুক্মিনী, (২) সত্যভামা (৩) জাম্ববতী, (৪) কালিন্দী, (৫) কৌশল্যা, (৬) ভদ্রা, (৭) শৈব্যা ও (৮) মাদ্রী এই আট জন প্রধান মহিষী। ইহাদের মধ্যে আবার রুক্মিনী ও সত্যভামা সর্ব্ব প্রধান। রুক্মিনী ঐশ্বর্য্যে প্রধান এবং সত্যভামা সৌভাগ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পরকীয়া—সে সকল নারী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া আসক্তি বশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করেন এবং যাঁহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় নাই তাঁহারাই পরকীয়া। পরকীযাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) কন্যকা ও পরোঢ়া। গোপগণ কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়াও যে সমস্ত গোপবধূ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের জন্য অত্যন্ত লালসাযুক্ত তাঁহারাই পরকীয়া নামে প্রসিদ্ধ।

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥৬॥ উ, নী, ৩য় অধ্যায়

এই সকল হরিপ্রিযাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। পরকীয়া আবার তিন ভাগে বিভক্ত (১) সাধনপরা—সাধনপরা আবার (ক) যৌথিকী ও (খ) অযৌথিকী—দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) যাঁহারা আপন আপন গণ সহ শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করেন তাঁহারা যৌথিকী—পূর্ব্বে যে সমস্ত মুনি গোপাল উপাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ হয় নাই, তাঁহারা বৃন্দাবনে গোপ-বধূরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। আবার ব্রজগোপীগণের পরম সৌভাগ্য দেখিয়া জ্ঞান-মাত্র সম্পন্ন উপনিষদ্‌সমূহ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রজধামে গোপবধূরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। (খ) গোপীভাবের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যে সকল

ব্যক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যধিক উৎকণ্ঠা হেতু এবং রাগানুগা মার্গে ভজনা করিয়া তাঁহাদের গোপীভাব সিদ্ধ হয় এবং তাঁহারা গোপবধূরূপে বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করেন। (২) দেবী—যখন শ্রীকৃষ্ণ অংশরূপে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাহার সন্তোষের জন্য নিত্যপ্রিয়াদের অংশ দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। (৩) নিত্যপ্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণের তুল্য রূপ ও গুণাদির দ্বারা ভূষিত হওয়ায় বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী নিত্যপ্রিয়া রূপে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে রাধিকা (গান্ধর্ব্বী), চন্দ্রাবলী (সোমাভা), বিশাখা, ললিতা (অনুরাধা), শ্যামা, ধনিষ্ঠা, গোপালী, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, ও পালী নিত্য প্রেয়সী মধ্যে প্রধান।

রাধা—এই সমস্ত নিত্য প্রেয়সীদের মধ্যে রাধিকা ও চন্দ্রাবলী প্রধান ; এবং মহাভাবস্বরূপা ও অশেষ গুণালঙ্কৃতা রাধিকা উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ ২ ॥ উ, নী, ৪র্থ অধ্যায়

সমস্ত গোপীগণ-মধ্যে রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির সার হ্লাদিনীশক্তি এবং এই হ্লাদিনীশক্তি সারস্বরূপা শ্রীরাধা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোঃ তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥৩॥ উ, নী, ৪র্থ অধ্যায়
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি বরীয়সী
তৎসার ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪ ॥ উ, নী, ৪র্থ অধ্যায়

শ্রীরাধা বৃষভানুর কন্যা, তিনি সুষ্ঠুকান্তা, সুরূপা ; ষোড়শ প্রকার সজ্জা তাঁহার অঙ্গে শোভা পায় এবং তিনি দ্বাদশ প্রকার আভরণ ধারণ করিয়া আছেন। তিনি পঞ্চবিংশতি গুণের আধার এবং বৃন্দাবনেশ্বরী। শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত মহিষী আছেন তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। এই সকল গোপবধূদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে প্রেম তাহা অমৃতের সমুদ্রের ন্যায়, অন্য কোনও গোপবধূতে তাহার একবিন্দুও নাই। নায়কের সমস্ত গুণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণে আছে শ্রীরাধিকাতেও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার নারীসুলভ গুণ বর্ত্তমান।

নায়িকা—প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র-প্রণেতাগণ নায়িকার তিন প্রকার ভাগ করিয়াছেন, (১) সাধারণী (২) স্বকীয়া ও (৩) পরকীয়া। সাধারণী নায়িকার বহু নায়ক থাকায় রসাভাস প্রসঙ্গ হয়। সামান্য বা সাধারণী নায়িকার নায়কের প্রতি দ্বেষ বা অনুরাগ নাই, তাহার প্রধান লক্ষ্য কেবলমাত্র অর্থ। কিন্তু মথুরাতে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমতী হইয়াই তাঁহার উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিল ; কুব্জা অন্য কোন নায়কের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে নাই,—তাই সাধারণী নায়িকা হইলেও কুব্জা পরকীয়া রূপে পরিগণিত হয়।

শৃঙ্গার রসে পরোঢ়া নারী নিষিদ্ধ বলিয়া অন্য আলঙ্কারিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই নিষেধ প্রাকৃত নায়িকার পক্ষে সিদ্ধ, কিন্তু অপ্রাকৃত নায়িকার পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে। মুখ্যরসে প্রাচীন পণ্ডিতগণের উক্ত নির্দ্দেশ ব্রজদেবীগণের পক্ষে চলিতে পারে না, কারণ রসশেখর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুর রসের আস্বাদনের জন্য ঐ সকল ব্রজদেবীর অবতারের কারণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজদেবীগণের যে ভাবনিষ্ঠা তাহা অন্য ভক্তগণের নাই। ব্রজদেবীগণের শিরোমণি স্বরূপ শ্রীরাধার প্রেমের জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বদাই উন্মুখ তইয়া থাকিতেন এবং শ্রীরাধিকার দর্শনমাত্রই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব লুপ্ত হইয়া ব্রজের ভাব প্রকাশিত হইত। ললিতমাধবে আছে,—

(উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৃত গৌতমী তন্ত্রের-পদ্যানুবাদ—উজ্জ্বল চন্দ্রিকাকার কৃত।)

গোপীর অদ্ভুত প্রেমা যাহার নাহিক সীমা যার পাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহা বুঝে হেন জন নাহি দেখি ত্রিভুবন যাহে বুদ্ধির নাহিক গমন ॥
চতুর্ভুজ রূপ ধরি যবে দেখা দেন হরি তবে সব গোপীকারগণ।
ঈশ্বরবুদ্ধি করি তায় কেহ না নিকটে যায় অনুরাগের হইল কুঞ্চন ॥
পরিহাস করি কভু চতুর্ভুজ হয়।
রাধিকার প্রেমে তারে দ্বিভুজ করয় ॥ (উ, চ)

স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকা আবার তিন প্রকার, (১) মুগ্ধা (২) মধ্যা ও (৩) প্রগলভা। কোন কোন আলঙ্কারিক কেবলমাত্র স্বকীয়া নায়িকার উপরোক্ত তিন প্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলঙ্কারিকগণের মতেই স্বকীয়া ও পরকীয়া উভয় প্রকার নায়িকাকে উক্ত তিন প্রকার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

মুগ্ধা—মুগ্ধা নায়িকার নূতন বয়স, নবপ্রেম, রতিবামা, সখীবশা, অতিব্রীড়ারতপ্রযত্না, রোষকৃত-বাষ্প-মৌনা এবং মানে বিমুখী।

মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতশ্চেষ্টাস্বতি ব্রীড় চারু গুঢ় প্রযত্ন ভাক্‌।
কৃতাপরাধে দযিতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়া প্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥

১১॥ উ. নী,॥ ৫ম অধ্যায়।

মানে বিমুখী আবার দুই প্রকার মৃদ্বি ও অক্ষমা। অতিব্রীড়ারতপ্রযত্না বলিতে রতি বিষয়ে অতিশয় লাজুক বলিয়া মনে হয়। মানে বিমুখী বলিতে ইহাই বুঝায় যে মান করিলে যেরূপ ভাব করিতে হয় তাহার বিপরীত। মৃদ্বি ভাব সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ধন্যা নামে একজন ব্রজদেবীকে তাঁহার সখিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ধন্যার সম্মুখে আসিলে ধন্যা তাহার নিকট হইতে দূরে না সরিয়া গিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন, ভ্রূকুটী করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহার উভয় নয়নে অনুরাগের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল এবং কটু বাক্যের বদলে অতি প্রিয় বাক্য বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলমণিতে 'অক্ষমা' সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অন্যান্য মানিনীগণকে লক্ষ্য করিয়া একজন হরিপ্রিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে এই সমস্ত মানিনীদের সাহস অত্যন্ত বেশী কারণ তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিতেছে। 'মান' এই দুইটি অক্ষর মনে করিলেই উক্ত হরিপ্রিয়ার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে।

মধ্যা—যে নায়িকা (১) সমান-লজ্জা-মদনা (অর্থাৎ যাহার লজ্জা ও শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গলাভের ইচ্ছা সমান) (২) যিনি উদ্যত্তারুণ্য (অর্থাৎ যাহার নব যৌবন) (৩) যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি (৪) যিনি মোহান্ত-সুরত-ক্ষমা (অর্থাৎ যিনি মূর্চ্ছিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ সুখলাভ করিতে সক্ষম) (৫) যিনি মান অবস্থায় কোমলা এবং (৬) কখনও কখনও যিনি মান অবস্থায় কর্কশা তাঁহাকে মধ্যা নায়িকা বলে।

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্য মালিনী।
কিঞ্চিৎ প্রগলভবচনা মোহান্ত সুরতক্ষমা।
মধ্যাস্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা।

১৭॥ উ. নী. ৫ম অধ্যায়

যে নায়িকা অপরাধী প্রিয়তমকে উপহাস সহ বক্রোক্তি করেন তাঁহাকে ধীরা মধ্যা বলা হয়। যে নায়িকা নিজের ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নায়ককে নিষ্ঠুর বাক্য বলেন তাহাকে অধীর মধ্যা বলে। যে নায়িকা মানবশত অশ্রু-জলের সহিত নায়কের প্রতি বক্র বাক্য বলেন তাঁহাকে ধীরাধীরা মধ্যা নায়িকা বলে।

প্রগলভা—যে নায়িকার (১) পূর্ণ তারুণ্য, (২) যিনি মদান্ধা (৩) যিনি উরুরত্যোৎসুকা (অর্থাৎ রতি বিষয়ে যাহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য) (৪) যিনি ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা (অর্থাৎ এককালে বহুভাব জানেন) (৫) যিনি রসাক্রান্তা বল্লভা (অর্থাৎ অতিশয় সম্ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হইয়া নায়ক স্বীয় বশীভূত হইয়া থাকেন ইহা যিনি আশা করেন); যথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মঙ্গলা—

অপরূপ কুসুম আনহ ইহ গহনে। বনফুলে কর মঝু অঙ্গকি ভূষণে॥
মাধব তুহু যদি মানসি বচনে। আনি কুসুম কুরু ভূষণ রচনে॥
হাম তুয়া প্রেয়সী গোকুল নগরে। ইহ যশ ঘোষিবে কামিনী নিকরে।
(উ, চ)

(৬) যিনি অতি প্রৌঢ় উক্তি করেন—অতি প্রৌঢ় উক্তি লইযা শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে একটি পদ পাওযা যায়। একদিন বিনানুমতিতে শ্যামলার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ আসিলে,শ্যামলা তাঁহার শ্বাশুড়ীকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয দিবেন এই ভয দেখাইলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়া লুকাইয়া রহিলেন সেই অবস্থায শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যামলার উক্তি :

ধীরে ধীরে আসি গৃহকোণে বসি অঙ্গ ঢাকিয়া তৃণে।
বিনয় করিযা কি আর বলিছ কে তোমার কথা শুনে॥
কোথা গেল আজি সে সব চাতুরী সে দিন যমুনা তীরে।
ভাঙ্গা তরি পাঞা গোপীগণ লঞা যে দুঃখ দিযাছ মোরে।
(উ চ)

(৭) যাঁহার অতি প্রৌঢ় চেষ্টা এবং (৮) যিনি মানে অত্যন্ত কর্কশ তাঁহাকে প্রগল্‌ভা নাযিকা বলা হয।

প্রগলভা পূর্ণ তারুণ্য মদান্ধোরুরত্যোৎসুকা।
ভূরি ভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্ত বল্লভা।
অতি প্রৌঢ়োক্তি চেষ্টা সোমানে চাত্যন্ত কর্কশা॥
২৪, উ, নী, ৫ম অধ্যা

মানের অবস্থায় প্রগল্‌ভা নায়িকাও (১) ধীর, (২) অধীর এবং (৩) ধীরাধীর এই তিনপ্রকার ভাবের অনুবর্ত্তী হন।

ধীর-প্রগল্‌ভা সম্ভোগ বিষয়ে উদাসীন এবং অবহিত্থা (আকার সঙ্গোপন করেন) ও আদরান্বিতা হন। অধীর প্রগল্‌ভা নিষ্ঠুর রূপে নায়ককে তাড়না করেন এবং ধীরাধীর প্রগল্‌ভা ধীর ও অধীর নায়িকার গুণ প্রাপ্ত হন।

নায়িকা পনেরো প্রকার যথা (স্বীয়া + পরকীয়া = ২) (মুগ্ধ + ধীর মধ্যা, অধীর মধ্যা + ধীরাধীর মধ্যা + ধীর প্রগল্‌ভা + অধীর প্রগল্‌ভা + ধীরাধীর প্রগল্‌ভা = ৭) = ১৪ + কন্যা মুগ্ধা = ১৫।

অষ্টাবস্থা—সকল নায়িকাই আট অবস্থা লাভ করেন। সেই আট অবস্থা—(১) অভিসারিকা (২) বাসক সজ্জা (৩) উৎকণ্ঠিতা (৪) খণ্ডিতা (৫) বিপ্রলব্ধা (৬) কলহান্তরিতা (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং (৮) স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

অভিসারিকা—প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে মন্মথমোহিতা প্রেমিকার যে আবেগ ও প্রেমময় যাত্রা তাহাকে অভিসার বলে। যে নায়িকা নায়ককে অভিসার করান এবং নিজে অভিসার করেন তাঁহাকে অভিসারিকা বলা হয়। জ্যোৎস্না রাত্রি হইলে শুভ্র বেশ এবং কৃষ্ণপক্ষ হইলে কৃষ্ণবর্ণ বেশ ধারণ করিয়া অভিসারিকা গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত নায়িকাকে জ্যোৎস্নাভিসারিকা এবং শেষোক্ত নায়িকাকে তমোভিসারিকা বলা হয়। অভিসার-সময়ে লজ্জা বশতঃ অভিসারিকা স্বীয় অঙ্গদ্বারা অঙ্গ সঙ্গোপন করেন এবং ভূষণ সকলের শব্দ বন্ধ করিয়া সখী সহ গমন করেন।

যাভিসারযতে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্না তামসীযানযোগ্যবেশাভিসারিকা।
সজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিল মণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥

৬৯, উ, নী, ৫ম অধ্যায়

(১)

মেঘ-যামিনি অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥

ঝলকত দামিনি দশদিশ আপি।
নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরি সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবিদনি সঙ্কেত-গেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাহা নাগর-রাজ॥ প, ক, ত, ।৩।৩৪৩

(২)

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নাহি মানযে বাধা॥
একলি করল পযান।
পন্থবিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হাব।
উচ কুচ মানযে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহিঁ তেজলি সগরি॥
মণিময় মঞ্জিব পায।
দুরহিঁ তেজি চলি যায॥
যামিনী ঘন—আন্ধিযার।
মনমথ হিয়ে উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আযুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতিভান।
ঐছে না হেরিযে আন॥ প, ক, ত, ।৪। ৪১৬

উজ্জ্বল নীলমণিতে মাত্র জ্যোৎস্নী ও তামসী এই দুই প্রকার অভিসারের উল্লেখ আছে, কিন্তু পীতাম্বর দাস তাঁহার রসমঞ্জরীতে আরও ছয় প্রকার অভিসারের কথা বলিয়াছেন। (ক) বর্ষা অভিসার (খ) দিবা অভিসার (গ) কুজ্ঝাটিকা অভিসার (ঘ) তীর্থযাত্রা অভিসার (ঙ) উন্মত্তা অভিসার ও (চ) সঞ্চরা অভিসার।

বাসক সজ্জিকা—যে নায়িকা প্রিয়তমের আসার প্রতীক্ষা করিয়া নিজের দেহ ও মিলন কুঞ্জ সুসজ্জিত করেন এবং প্রিয়তমের সহিত সম্ভোগ মনে মনে জল্পনা করিয়া সখার সহিত কৌতুক আলাপ করিতে করিতে দূতীর পথ পানে তাকাইয়া থাকেন তাঁহাকে বাসকসজ্জিকা বলে।

স্ব বাসক বশাৎকান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যাসা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসংকল্পো বর্ত্মবীক্ষণং।
সখী বিনোদ বার্ত্তাচ মহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥
... ... ৪২, উ, নী, ৫ম অধ্যায়

বাসিত বারি ক— পূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদন-শয়ান।
উজোর দীপ স— মীপহি জারই
বিরচহ চারু বিতান॥
সখি হে কহই ন যায়ে আনন্দ।
ঋতু-পতি রতি অবহুঁ নব নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥
কুসুমিত-মৌলির— সালক পরিমলে
ভ্রমর ভ্রমরি রহু ভোর।
মদন-মনোরথে সগরিহ যামিনি
সুখে বঞ্চিব হবি কোর॥
বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব একবর
চেতন রহু মঝু দেহ
গোবিন্দ দাস কহই হরি-পরশহি
সো পুন হোত সন্দেহ। ৫।৩০৮। প, ক, ত

পীতাম্বর দাস তাঁহার রসমঞ্জরীতে আট প্রকার বাসক সজ্জিকার উদাহরণ দিয়াছেন। (১) মোহিনী (২) জাগ্রতী (৩) রোদিতা (৪) মধ্যোক্তিকা (৫) সুপ্তিকা (৬) প্রগল্ভা (৭) বিনীতা ও (৮) সরমা।

উৎকণ্ঠিতা—নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আসিলে বিরহ বশত নায়িকার যে ঔৎসুক্য হয় রসজ্ঞরা সেই অবস্থাকেই উৎকণ্ঠা বলেন। এই অবস্থায় নায়িকার হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন, নায়কের বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে

নানারূপ জল্পনা, স্বাস্থ্যভঙ্গ, রোদন এবং নিজের অবস্থা বর্ণনা প্রভৃতি উৎকণ্ঠিতা নায়িকার লক্ষণ।

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকাতু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সাসমীরিতা॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণং।
আরতির্বাষ্প মোক্ষশ্চ স্বাবস্থা কথনাদয়ঃ।৪৩।

উ, নী, ৫ম অধ্যায়।

বাসক-সজ্জাদশার শেষে, মানের বিরতিতে এবং নায়ক ও নায়িকার পরাধীন অবস্থার জন্য সঙ্গমের অভাব হইলে উৎকণ্ঠা হয়—

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত
আর কত বিঘিন বিথার।
কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি কি ফল পাপ পরাণ।
যামিনি আধ— অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলিল কান॥ ধ্রু॥
যতযে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু-পিরিতি অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধল
ভাণ্ডু ভুজঙ্গিনি পাশে॥
দারুণ কুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন-গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে দুহুঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারী॥৬॥ ৩৪৬ প, ক, ত

পীতাম্বরদাস তাঁহার রসমঞ্জরীতে আট প্রকার উৎকণ্ঠিতার বিরবণ দিয়াছেন—(১) উন্মত্তা, (২) বিকলা (৩) স্তব্ধা (৪) চকিতা (৫) অচেতনা (৬) সুখোৎকণ্ঠিতা (৭) প্রগল্‌ভা ও (৮) নির্ব্বন্ধা।

খণ্ডিতা—নায়ক পূর্ব্বে মিলনের আশা দিয়া সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে না আসিয়া অন্য নারীর সহিত সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া পরদিন সকালে আশাহতা নায়িকার কাছে আসিলেন

এবং তখন তাহার শরীরে অন্য নারীসম্ভোগের সমস্ত চিহ্ন বর্ত্তমান। তাঁহাকে দেখিয়া সেই আশাহতা নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ এবং তুষ্ণীভাব অবলম্বন প্রভৃতি খণ্ডিতা নায়িকার লক্ষণ—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগ লক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা॥
এষাতুরোষ নিশ্বাস তুষ্ণীং ভাবাদি ভাগ্ ভবেৎ
॥৪৫॥ উ নী ৫ম অধ্যায়

ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে
প্রভাতে দেখিনু মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই॥ ধ্রু॥
আই আই পড়িছে রূপ কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনলোভা॥
খর-নখ দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ি কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলে রজনি॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারিপানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥৫॥৪০৩ প, ক, ত

পীতাম্বরদাস তাঁহার রস মঞ্জরীতে আটপ্রকার খণ্ডিতার উল্লেখ করিয়াছেন—(১) বিদগ্ধিকা, (২) নিন্দয়া, (৩) ক্রোধা ভয়ানকা, (৪) প্রগল্ভা, (৫) মুগ্ধা, (৬) রোদিতা, (৭) প্রেমমত্তা ও (৮) মধ্যা।

বিপ্রলব্ধা—সংকেত করিয়া নায়ক উপস্থিত না হইলে আশাহতা নায়িকার অত্যন্ত শোক হয়, নায়িকার এইরূপ অবস্থাকে বিপ্রলব্ধা বলে। বৈরাগ্য, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি বিপ্রলব্ধার লক্ষণ—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবতি বল্লভে।
ব্যর্থমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদ চিন্তাখেদাশ্রুমূর্চ্ছানিশ্বসিতাদি ভাক্॥ ৪৭॥ উ, নী, ৫ম অধ্যায়।

কাহুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এতদিনে সই নিচয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরখ জাতি ॥
মেঘ ছুর ছুর দাদুরীর বোল
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আঁধিয়ারে বিজরী ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে ॥
যতনে সাজালুঁ ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি সহন ন যায়
দারুণ বিরহ জরে ॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কাহুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে ॥৮॥৩৪৮ প, ক, ত

পীতাম্বর দাস তাঁহার রসমঞ্জরীতে আট প্রকার বিপ্রলব্ধা নায়িকার কথা বলিয়াছেন—(১) নির্ব্বন্ধা, (২) প্রেমমত্তা (৩) ক্লেশা (৪) বিনীতা (৫) নিন্দয়া (৬) প্রখরা (৭) দ্যুতাদরী ও (৮) চর্চ্চিতা।

কলহান্তরিতা—যে নায়িকা সখীজনের সম্মুখে পদানত প্রিয়তমকে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতাপ করে তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিশ্বাস কলহান্তরিতার লক্ষণ—

যা সখীণাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্ত পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ সন্তাপ গ্লানি নিশ্বসিতাদয়ঃ ॥
৪৮।উ, নী, ৫৪ অধ্যায়।

আকুল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ ॥

সজনী তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সো তাপিনি জগমাহ ॥ ধ্রু ॥
যো হম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সে অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ মানসঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক নেহ ॥২॥ ৪৮৩ প, ক ত

পীতাম্বর দাস তাঁহার রসমঞ্জরীতে আট প্রকার কলহান্তরিতা নায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন—(১) আগ্রহা, (২) বিকলা, (৩) ধীরাবচন, (৪) অধীরাবচন, (৫) কোপনাবর্তী, (৬) সখ্যুক্তিকা, (৭) সমাদরা ও (৮) মুগ্ধা।

প্রোষিতভর্তৃকা—নায়ক দূর দেশে গমন করিলে তাঁহার আগমন পথের দিকে যে প্রিয়তমা তাকাইয়া থাকেন তাঁহাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলা হয়। প্রিয়তমের আসা-পথ চাহিয়া তিনি প্রিয়তমের গুণ গান করেন, তাঁহার আলস্য হয়, তাঁহার অঙ্গ শোভা কমিয়া গিয়া ক্ষীণ হয়, প্রিয়তমের জন্য তিনি সর্বদা চিন্তা করেন, তাহাতে তাঁহার অস্থিরতা আসে, নিদ্রা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া প্রিয়তমের জন্য তিনি প্রলাপ বাক্য বলেন—

দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।
প্রিয় সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানব জাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্য চিন্তাদয়োমতাঃ। ৪৯, উ, নী, ৫ম অধ্যায়।

হরি গেও মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পরল যৈসে মালতিক মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাস ॥

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥৮॥১৬৪১ প, ক, ত

পীতাম্বরদাস রসমঞ্জরীতে ভাবী ভবন আর অতীত এই তিন প্রকার প্রোষিতভর্ত্তৃকার উল্লেখ করিয়াছেন। ভানুদত্ত তাঁহার রসমঞ্জরী গ্রন্থে প্রোষ্যাৎপতিকা নামে নবম নায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহার স্বামী অচিরে বিদেশে যাইবেন তিনি প্রোষ্যাৎপতিকা।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা—প্রিয়তম সতত অধীন হইয়া সর্ব্বদা নায়িকার নিকটে থাকেন, সেইরূপ নায়িকাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলে—

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।
সলিলারণ্য বিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥৪৯॥, উ, নী, ৫ম অধ্যায়।

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর ॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিমলোচন ॥
তোমার পীত-বাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী ॥
তোমার গলার বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় সুধাইলে গোকুলে ॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি ॥৪॥৬৫৯, প, ক, ত।

(২)

লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি মূল।
অতসি-কুসুম-সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
রূপণ হেম সমতুল ॥
যাবক চীত চরণ পর লিখই
মদন-পরাজয় পাত।

গোবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল

কানুক আর কত হাত ১৫।২০১৩। প, ক, ত

পীতাম্বরদাস রসমঞ্জরীতে আট প্রকার স্বাধীনভর্তৃকার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) কোপনা, (২) মানিনী, (৩) মুগ্ধা, (৪) মধ্যা (৫) উক্তকা (৬) উল্লাসা (৭) অনুকূলা ও (৮) অভিষেকা।

ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের তাবতম্য অনুসারে কেহ উত্তমা কেহ মধ্যমা এবং কেহবা কনিষ্ঠা নায়িকা নামে অভিহিত হন।

পূর্ব্বে (যে) ১৫ প্রকার নায়িকার উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ১৫ প্রকার নায়িকা × (অভিসারিকা প্রভৃতি আট প্রকার নায়িকা) = ১২০ প্রকার নায়িকা, ১২০ × (উত্তমা + মধ্যমা + কনিষ্ঠা = ৩) = সর্বসমেত ৩৬০ প্রকার নায়িকার কথা বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে বর্ণিত হইযাছে।

যূথেশ্বরী—শ্রীরাধা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণেব নিত্যপ্রিয়াগণ সকলেই যূথেশ্বরী; ইঁহাদের মধ্যে বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা শ্রীরাধার সখ্যলোভে যূথেশ্বরী হন নাই। যূথেশ্বরীদের মধ্যে আবার সৌভাগ্যের তারতম্য অনুসারে (১) অধিকা (২) সমা ও (৩) লঘ্বী এই তিন প্রকার বিভাগ আছে। যূথেশ্বরীগণ বিপক্ষকে সাক্ষাৎভাবে নিন্দা করে না কারণ তাঁহারা ধৈর্য্য'ও গাম্ভীর্য্যগুণের আধার।

দূতী—নায়িকাদের মুখ্য সহায় দূতী। দূতী দুই প্রকার—স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী। স্বয়ং দূতী—প্রেমাস্পদের প্রতি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া গভীর অনুরাগের জন্য লজ্জা বিসর্জন দিয়া যিনি স্বযং অভিযোগ (অর্থাৎ প্রেমাস্পদের কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ) করেন তাহাকে পণ্ডিতগণ স্বয়ংদূতী বলেন। এই অভিযোগ তিন প্রকার—(১) কায়িক, (২) বাচিক, ও (৩) চাক্ষুষ।

(১) কায়িক বা আঙ্গিক—শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আঙ্গুলের শব্দ করা, ত্বরা করা, শঙ্কা দেখান ও লজ্জাবনত শরীর আবরণ, পায়ের দ্বারা ভূমিতে লেখা, কান চুলকান, তিলক ক্রিয়া, বেশরচনা, ভ্রূবিক্ষেপ, সখীর প্রতি আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধরদংশন, গলার হার লইয়া খেলা, অলঙ্কারাদির শব্দকরণ, বাহুমূল প্রকাশ করা, শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখা এবং এবং একটি লতার সহিত অপর আর একটি লতার মিলন করা প্রভৃতি ভাবকে কায়িক বা আঙ্গিক বলা হয়।

(২) বাচিক—বাচিক দুই প্রকার (ক) শ্রীকৃষ্ণ বিষয় ও (খ) পুরস্থ।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যখন নায়িকা গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞা করিয়া

নিজের প্রেম ও সঙ্গলাভের আকাঙ্খা করেন তাহাকে বাচিক বলা হয়। কোন নায়িকা আবার ছল করিয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। যথা—

লুবুধ মধুপ যার নাহি পায় গন্ধ। ফল ফুলে বিকাসিত সেই ত মাকন্দ॥
হেদে হে কোকিলবর ইহ রস ছাড়ি। কেন বা ফিরিছ তুহু এ কানন বেড়ি॥ (উ, চ)

উপরোক্ত যাচ্ঞা আবার দুই প্রকার। নিজের জন্য ও পরের জন্য।

(খ) পুরস্থ—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে নায়িকা কথা বলিতেছেন, কিন্তু এরূপ ছল করিয়া বলিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিতে পারিতেছেন না ; শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত আছেন কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাতভাবে কিছু না বলিয়া নায়িকা যদি তাঁহার বক্তব্য অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন তবে তাহাকে পুরস্থ বলে। যথা (শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে কোন নায়িকার ছলপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গিরির প্রতি উক্তি)—

পুষ্প তুলিবার জন্যে এলাম তোমার স্থানে তুয়া গুণে জগতে প্রকাশ।
কর ইহার উপায় তুমি বহুপুষ্প দাও পুরাহ মনের অভিলাষ॥ (উ, চ)

(৩) চাক্ষুষ—চোখের কোণে হাসি আনিয়া চোখের প্রান্ত ঘূর্ণন করিয়া বাঁকা চাহনির দ্বারা এবং নায়কের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নায়ককে নিজের প্রতি বিশেষভাবে প্রলুব্ধ এবং অনুরক্ত করিয়া তোলার ইচ্ছাপ্রকাশে যে লাস্যভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে চাক্ষুষ দৌত্য বলে।

স্বয়ং দূতীর সর্ব্ব প্রকারের উদাহরণ না দিয়া আমরা মাত্র ১টি উদাহরণ দিব।

মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু
সহই ন পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গৌরি আলাপি শ্যাম নট সঙ্কর
তব তুহুঁ বিদগধ জান॥ ধ্রু॥
মুরলি ছোড়ি অছু মধুর আলাপবি
তেসর জনি জন জান।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে
যতি খণে হোত সুঠান॥

নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতি ভাস।
গুণিজন-লাজ যৈছে নাহি হোযত
কহতই গোবিন্দ দাস ॥৫॥৬২১ প, ক, ত।

আপ্ত দূতী—যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না, অতিশয় স্নেহসম্পন্না এবং বাক্ বিন্যাসে পটু তাঁহাকেই ব্রজদেবীগণের আপ্তদূতি বলা হয়। আপ্ত দূতি তিন প্রকার (১) অমিতার্থা, (২) নিসৃষ্টার্থা ও (৩) পত্রহারী। নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার অভিলাষ জানিতে পারিয়া যিনি উভয়কে মিলিত করান, তাঁহাকে অমিতার্থা দূতী বলে।

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে একজন কর্তৃক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তি দ্বারা যিনি উভয়ের মিলন সম্ভবপর করেন তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী কহে।

যে দূতী কেবলমাত্র নায়ক বা নায়িকার সংবাদ বহন করেন তাঁহাকে পত্রহারী দূতী বলা হয়।

উল্লিখিত আপ্ত দূতীর মধ্যে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (অর্থাৎ তপস্বিনীর বেশ ধারিণী) পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাগ আছে। আপ্তদূতীর একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয়া মঞ্জির-বরে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহাঁ তুহুঁ গোরি আরাধনি কান।
জানলুঁ ঐছই তোহে মন মান॥
স্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলি নিশান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐছন যতহু মরম অভিলাষ।
কতহু নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥ ১২॥৩৯ প, ক, ত

নায়িকার উৎকণ্ঠা প্রভৃতি দর্শন করিয়া যে দূতী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাইয়া তাঁহাকে নায়িকার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুনয় করেন তাহাকে ক্রিয়াসাধ্য দূতী বলা হয়।

সখী—প্রেমলীলা ও বিহার বিস্তারের যিনি সহায়তা করেন তাঁহাকেই সখী বলা হয়। সখী দ্বাদশপ্রকার (১) আত্যন্তিকাধিকা প্রখরা (২) আত্যন্তি-কাধিকা মধ্যা (৩) আত্যন্তিকাধিকা মৃদ্বী (৪) আপেক্ষাধিকা অধিকা প্রখরা (৫) আপেক্ষাধিকা অধিকা মধ্যা (৬) আপেক্ষাধিকা অধিকা মৃদ্বী (৭) সম প্রখরা (৮) সম মধ্যা (৯) সম মৃদ্বী (১০) [আপেক্ষিকী ও আত্যন্তিকী] লঘু প্রখরা (১১) লঘুমধ্যা ও (১২) লঘুমৃদ্বী।

দূতী বা সখী সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নায়িকাদের মিলনের ব্যবস্থা ও উপায় করিয়া দেন। দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা কখনই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের ইচ্ছা করেন না, বরঞ্চ সঙ্গ লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদি তাহাদের কাছে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সঙ্গ দানের জন্য অনুনয় করেন, তবে তাঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। কোনও যূথেশ্বরী কখনও কখনও কোন প্রিয় সখীর প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করেন। তখন সেই সখী "নিত্য-নায়িকা" রূপে খ্যাত হন। কোনও যূথেশ্বরী প্রত্যুপকার ছলে তাহার সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করান তখন সেই সখী "নায়িকা-প্রায়া" নামে অভিহিত হয়। সম প্রখরা, সম মধ্যা ও সম মৃদ্বী এই তিনের পরস্পর দৌত্য ও নায়িকাত্ব তুল্য হয় অতএব তাহাদিগকে 'দ্বিসমাদ্রিক' বলা হয়।

লঘুগণ সর্ব্বদা নায়িকার দৌত্য করে সেইজন্য তাহাদিগকে 'সখী প্রায়াত্রিক' কহে। নায়িকার প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সখ্য ভাবে প্রীত থাকিয়া তাঁহার সখীর আচরণ করিলে তাঁহাকে "নিত্য সখী" বলা হয়।

সখীর কাজ—সখীগণের নিম্নলিখিত সতের প্রকার কাজ (১) নায়িকার কাছে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে নায়িকার বর্ণনা করা (২) নায়িকা যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন, শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে নায়িকার প্রতি আকৃষ্ট হন তাহার চেষ্টা করা (৩) নায়ক ও নায়িকার অভিসার করান (৪) নায়িকাকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ (৫) নর্ম্ম (পরিহাস) (৬) শ্বাসন (আশ্বাস প্রদান করা) (৭) নেপথ্য (নায়িকার বেশ করণ) (৮) মনোগত ভাব প্রকাশ করণে পটুতা (৯) ছিদ্র সংবৃতি (নায়িকার দোষ গোপন) (১০) স্বামী প্রভৃতি অন্যান্য

গুরুজনকে বঞ্চনা করা (১১) শিক্ষা প্রদান (১২) উপযুক্ত সময়ে নায়ক নায়িকাকে মিলিত করা (১৩) চামরাদি দ্বারা সেবা করা (১৪ এবং ১৫) নায়ক ও নায়িকাকে উপালম্ভ (তিরস্কার) (১৬) সংবাদ প্রেরণ করা এবং (১৭) বিরহ সন্তাপে শীর্ণা নায়িকার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করা।

সখীগণের মধ্যে কেহ আবার নায়িকা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকেই বেশী স্নেহ করেন; তাঁহাকে 'হরি স্নেহাধিকা' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকাতে যাহার সমান স্নেহ তাঁহাকে 'সমস্নেহা' বলা হয়; আবার যিনি নায়িকার প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'প্রিয়সখী' বলা হয়।

উদ্দীপন—আমরা এতক্ষণ আলম্বন বা আবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন উদ্দীপন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে উদ্দীপনাকে বলা হইয়াছে 'উদ্দীপনস্ততে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে' (১ম লহরী, ২৯১ শ্লোক) অর্থাৎ রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত যে প্রকাশ করে তাহাকে উদ্দীপন কহে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের (১) গুণ, (২) নাম, (৩) চরিত্র (৪) ভূষণ, (৫) সম্বন্ধী ও (৬) তটস্থ—এই কয়টিকে উদ্দীপন বিভাব বলা যায়।

(১) **গুণ**—গুণ আবার (ক) মানসিক, (খ) বাচিক ও (গ) কায়িক এই তিন প্রকার। কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি বা ক্ষমা ও করুণাদি গুণসকলকে মানসিক বলে। যাহা শুনিলে আনন্দ হয় তাহাকে 'বাচিক' বলে। কায়িক গুণ সাত প্রকার (ক) বয়স (খ) রূপ (গ) লাবণ্য (ঘ) সৌন্দর্য্য (ঙ) অভিরূপতা (চ) মাধুর্য্য ও (ছ) মার্দ্দব বা মৃদুতা।

বয়স—বয়স চারি প্রকার (১) বয়ঃ সন্ধি (২) নব্য (৩) ব্যক্ত ও (৪) পূর্ণ। এখানে কৃষ্ণপ্রিয়াদের বয়স সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কেবলমাত্র প্রসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণের বয়স লইয়া আলোচনা করিব। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার বয়সের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা—পৌগণ্ড (পাঁচ বছর পর্য্যন্ত বয়স), কৌমার (১০ বছর বয়স) ও কিশোর (১১ হইতে পনর বছর পর্য্যন্ত বয়স)।

(ক) বয়ঃসন্ধি—পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধি সময় অর্থাৎ কৈশোর অবস্থা। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির উদাহরণ,—

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥

বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণিয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লই অব করত শিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি।
হাসত আপন পযোধর হেরি॥
পাইল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরয়ে অঙ্গ॥
মাধব পেখলুঁ অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
দুহুঁ এক যোগ ইহকে কহে সেয়ানি॥ ১৬।৮২ প, ক, ত।

(খ) নব্যবয়ঃ—যে বয়সে স্তনযুগল ঈষৎ উদ্ভিন্ন, নয়ন ঈষৎ চঞ্চল, মুখে অল্প হাসি ও ভাব সকল প্রকাশ করিবাব ক্ষমতার সূত্রপাত তাহাকে নব্যবয় বলা হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীমতীব প্রতি বৃন্দা—

অল্প অল্প তোর স্তন বক্র বক্র ও বচন নেত্র দুই কিঞ্চিৎ চঞ্চল।
জঘন হইল ঘন ব্যক্ত হইল রোমগণ মধ্যক্ষাণ করে টলমল॥(উ.চ)

(গ) ব্যক্ত যৌবন—যে বয়সে স্তনদ্বয় ব্যক্ত হয়, মধ্যদেশে ত্রিবলি দেখা দেয় এবং সমস্ত অঙ্গ উজ্জ্বল হইযা উঠে, তাহাকে ব্যক্ত যৌবন বলে। .

(ঘ) পূর্ণ বয়ঃ—যে বয়সে নিতম্বের বিপুলতা, মধ্যদেশের ক্ষীণত্ব অঙ্গ সকলের উজ্জ্বল কান্তি, স্তনদ্বযের স্থূলতা ও উরুযুগ রম্ভার ন্যায় হয় তাহাকে পূর্ণবয়ঃ বলে।

রূপ—শরীরে অলঙ্কারাদি না থাকিলেও যে গুণের জন্য অঙ্গ বিভূষিত বলিযা মনে হয় তাহাকে রূপ বলে। বিদগ্ধ মাধবে শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য—

রাইক অলকা চিকুর বিলাসে। কস্তুরী পত্রক কমল বিলাসে॥
রাইক চঞ্চল নযন তরঙ্গ। শ্রুতিযুগ কুবলযদ্যুতি করু ভঙ্গ॥
ও মুখ মৃদু মৃদু হাস বারবার। যাহে বিফল গেল রতন কি হার॥
সুন্দর রাইক অঙ্গ কি মাঝ। আভরণগণ সব পাওল লাজ॥(উ,চ)

লাবণ্য—মুক্তার ভিতর হইতে তাহার আভা যেরূপ স্বতঃই বাহির হয়

সেইরূপ যে অন্তর্নিহিত জ্যোতির ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বতঃই ঝলমল করে তাহাকে বলে লাবণ্য। লবণের অভাবে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদ হয় না, তেমনি লাবণ্যের অভাবে রূপেরও সম্যক প্রকাশ ঘটে না।

সৌন্দর্য্য—অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সুষ্ঠু সমাবেশকে সৌন্দর্য্য বলা হয়,—

কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম বেশিনি
রস-আবেশিনিরে ॥
অধর সুরঙ্গিনি অঙ্গ তরঙ্গিনি
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে ॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে ধনী।
ব্রজরমণীগণ মুকুট-মণি ॥
কুঞ্জর গামিনি মোতিম দামিনি (দশনি পাঠান্তরটি ভাল মনে হয়)
দামিনি চমক নেহারিণি রে।
আভরণ ধারিনি নব অভিসারিণি
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিনি রে ॥
নব অনুরাগিণি অখিল-সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিনি মোহিনি রে।
রাস-বিলাসিনি হাস বিকাশনি
গোবিন্দ দাস চিত মোহনিরে ॥ ৫॥২৭০ প, ক, ত।

অভিরূপতা—যাহা নিজের গুণের উৎকর্ষের জন্য নিকটবর্ত্তী বস্তুকে নিজের রূপে রূপান্তরিত করে সেই গুণকে অভিরূপ বলে। উজ্জ্বলনীল-মণিতে বিশাখার উক্তি—

কৃষ্ণের দশনে বসি স্ফটিক হইল বাঁশী হাতে হয় পদ্মরাগ মণি।
গণ্ডের নিকটে যেঞা ইন্দ্রনীলমণি হঞা বাঁশী হল রতনের খনি ॥ (উ, চ)

মাধুর্য্য—শরীরের কোনও অনির্ব্বচনীয় রূপকে মাধুর্য্য বলে। উজ্জ্বলনীল-মণিতে শ্রীমতীর প্রতি বিশাখার বাক্য,—

কিরূপ দেখিলাম আমি রবিসুতা কূলে বরণী না হয় রূপ মন রৈল ভুলে।
আঁখিঠারে কুলবতীর ব্রত হৈল নাশ এমন মাধুর্য্য কৃষ্ণ অঙ্গে পরকাশ।(উ,চ)

মার্দ্দব—কোমল বস্তু স্পর্শ সহ্য করিতে না পারাকে মার্দ্দব বলে। ইহা আবার উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন ভাগে বিভক্ত।

(২) **নাম**—শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিযাই শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন,—

সই কেবা নাম শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পাবে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশ কিবা হয।
যেখানে বসতি তার নযনে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায গো
কি করিব কি হবে উপায।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়। ১০। ১৪১ প, ক, ত

(৩) **চরিত্র**—শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রগুণে নাযিকাদের মোহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি করে। চরিত্র আবার দুই প্রকার (ক) অনুভাব ও লীলা। আমরা এখানে লীলা চরিত্রের বর্ণনা করিব। অনুভাব চরিত্র পরে আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর ক্রীডা, তাণ্ডব (নৃত্য), বংশীবাদন, গো-দোহন, গো-আহ্বান ও গমন প্রভৃতি লীলা বলিযা বর্ণিত হইযাছে।

(৪) **ভূষণ**—ভূষণ বা মণ্ডপ চারি প্রকার—(ক) বস্ত্র (খ) ভূষা (গ) মাল্য আর (ঘ) অঙ্গ বিলেপন।

(৫) **সম্বন্ধী**—সম্বন্ধী দুই প্রকার (ক) লগ্ন ও (খ) সন্নিহিত। (ক) লগ্ন আবার আট প্রকার, বংশীরব, শৃঙ্গীরব, গীত, সৌরভ, ভূষধ্বনি, (ভূষণের শব্দ) পদাঙ্কাদি, বীণা—আদির ধ্বনি ও শিল্প কৌশলাদি। ইহার মধ্যে কেবল মাত্র বংশীরবের উদাহরণ দেওয়া গেল।

কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমনে শবদ আসি।

এ কি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহিল পশি ॥
সান্ধাঞা মরমে ঘুচাঞা ধরমে
করিলে পাগলীপারা।
চিত থির নহে সোয়াস্থ্য না রহে
নয়নে বহয়ে ধারা ॥
কি জানি কেমন সেই কোন জন
এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে ॥
পরাণ না ধরে ধক-ধক করে
রহে দরশন আশে।
যবহুঁ দেখিবে পরাণ পাইবে
কহয়ে উদ্ধব দাসে ॥৫॥৩২ প, ক, ত

(খ) সন্নিহিতা—নির্মাল্যাদি, বর্হ, পর্ব্বতধাতু (গিরিগোবর্দ্ধনের গৈরিক শোভা), ধেনু—সমুদয়, লগুড়ি বেণু, শৃঙ্গ, প্রিয়দরশন, ধেনু-ধূলি, বৃন্দাবন, তদাশ্রিতগণ (অর্থাৎ বৃন্দাবনের পাখী, ভ্রমর, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকার ও কদম্ব ইত্যাদি), গোবর্দ্ধন, কালিন্দী, আর রাসস্থলী।

(৩) তটস্থা—জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, চন্দ্র, সুগন্ধি, মলয় ও পাখী ইত্যাদিকে তটস্থা উদ্দীপন বলা হয়।

অনুভাব—অনুভাবের আভিধানিক অর্থ সুখানুভূতি। অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে অনুভাব অর্থ রসব্যঞ্জক ভ্রূভঙ্গাদি। কাব্যালঙ্কার মতে স্থায়ী ভাবের কার্য্যকে অনুভাব বলে—ইহা হইতে রসের উৎপত্তি হয়। অনুভাবকে (ক) অলংকার, (খ) উদ্ভাসব এবং (গ) বাচিক ভেদে ভাগ করা হইয়াছে।

(ক) অলঙ্কার—যৌবনকালে সত্ত্বগুণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহে নায়িকাদের কুড়ি প্রকার অলঙ্কার প্রকাশ পায়। অলঙ্কার আবার তিন প্রকার (অ) অঙ্গজ, (আ) অযত্নজ ও (ই) স্বভাবজ।

(অ) অঙ্গজ আবার তিন প্রকার। (১) ভাব (২) হাব ও (৩) হেলা।

(১) ভাব—শৃঙ্গার রসে নির্ব্বিকার চিত্তে রতি নামে স্থায়িভাবের আবির্ভাব হইলে যে প্রথম বিকার হয় তাহাকে ভাব বলা হয়।

(২) হাব—ভাব যখন অল্প প্রকাশ করা যায় তাহাকে হাব বলে। গ্রীবা বাঁকা করিয়া, এবং নয়ন ও ভ্রূভঙ্গির সাহায্যে উক্ত হাব প্রকাশ করা হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার উদাহরণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

তোমার যুগলনেত্র হইয়াছে অর্দ্ধ মুদ্র ভুরুলতা করিছে নর্ত্তন।
মনেতে জানিলাম আমি মাধব দেখেছ তুমি তেই হয় এত ভাবোদ্গম॥
(উ. চ)

(৩) হেলা—এই হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গার-সূচনা করে তবে তাহাকে হেলা বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে হেলাব এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

বেণু শুনি দুই স্তন স্ফূর্ত্তি করে অনুক্ষণ চঞ্চল তোমার দুনয়ন।
পুলকিত সব অঙ্গ স্বেদ জলের তরঙ্গ আদ্র হইল জঘন বসন॥
সখি, সম্মুখে ফিরিছে গুরুজন।
সম্বরিতে বলি আমি প্রমাদ না কর তুমি অভিসারের এই নহে ক্ষণ॥
(উ. চ)

(আ) অযত্নজ—অযত্নজ সাত রকম (১) শোভা, (২) কান্তি, (৩) দীপ্তি (৪) মাধুর্য্য (৫) প্রগল্‌ভতা, (৬) ঔদার্য্য ও (৭) ধৈর্য্য।

(ই) স্বভাবজ দশ প্রকার :—

(১) লীলা—প্রিয়তমের ন্যায় রম্য বেশভূষা ধারণ করাকে লীলা বলে। উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

(সখী প্রতি রতি মঞ্জরী)

মৃগমদ লেপি অঙ্গে পীত বস্ত্র পরি রঙ্গে কেশে করি চূড়ার নির্ম্মাণ।
রাধা কৃষ্ণরূপ ধরি করেতে মুরলী করি করে অতি সুমধুর গান॥
(উ. চ)

(৩) বিলাস—গতি, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদি সকলের প্রিয় সঙ্গম জন্য যে বিশিষ্টতা হয় তাহাকে বিলাস বলে।

(৩; বিচ্ছিত্তি—(ক) অল্প বেশভূষা করিলেও যে পরম শোভা হয় তাহাকে বিচ্ছিত্তি কহে। (খ) নায়কের অপরাধ দেখিয়া যে নায়িকা আভরণ সকল পরিত্যাগ করেন এবং সখীদের বহু উপরোধেও তাহা আর পরিধান করেন না তাহাকেও কেহ কেহ বিচ্ছিত্তি বলেন।

(৪) বিভ্রম,—(ক) প্রিয়তমের কাছে অভিসারে যাইবার সময় প্রবল অনুরাগ হেতু হার মাল্যাদি অযোগ্য স্থানে ধারণ করিলে তাহাকে বিভ্রম বলা হয়। (খ) প্রিয়তমের প্রতি রুষ্ট হইলে, সেবাপরায়ণ প্রিয়তমের প্রতি যে অনাদর প্রকাশ করা হয় কেহ কেহ ইহাকেও বিভ্রম বলেন।

(৫) কিলকিঞ্চিত,—(ক) হর্ষের জন্য একসঙ্গে যদি গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয ও ক্রোধ হয় তবে তাহাকে কিলকিঞ্চিত কহে। (খ) অঙ্গ স্পর্শ না করিয়া পথ আটকাইলেও কিলকিঞ্চিত বলা হয়।

(৬) মোট্টায়িত—প্রিযতমের কথা মনে করা ও তাহার সংবাদ শুনিয়া প্রিয়তমের বিষয়ে স্থায়ীভাবের ভাবনা জন্য হৃদয়ে যে অভিলাষের উদয় হয তাহাকে মোট্টাযিত বলে।

(৭) কুট্টমিত—প্রিয়তম আসিয়া অঙ্গস্পর্শ করিলে, হৃদয়ে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বাহৃত অসম্মানসূচক ভাব প্রকাশ করিলে তাহাকে কুট্টমিত বলা হয়।

(৮) বিব্বোক—গর্ব্ব ও মান করিয়া প্রিযতমের উপহারে অনাদর প্রকাশ করাকে বিব্বোক বলে।

(৯) ললিত—যাহাতে সমস্ত অঙ্গের বিন্যাস ভঙ্গি, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূবিলাসের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায় তাহাকে ললিত বলে।

(১০) বিকৃত—লজ্জা, মান ও ঈর্ষার জন্য মনের প্রকৃত কথা প্রকাশ না করিয়া ইঙ্গিত বা অন্য কোন প্রকার চেষ্টার দ্বারা প্রকাশ করাকে বিকৃত বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে মানহেতু বিকৃতির এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—
(উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

কি কব কুটিল প্রেমা মান কৈল সত্যভামা হেনকালে চান্দের গ্রহণ।
আমি ত আসক্ত চিত্তে তারে গেলাম প্রসাদিতে চন্দ্রগ্রহ হৈযা বিস্মরণ॥
আমার বিনয় শুনি এক ইন্দ্র নীলমণি নিজ মুখ-চন্দ্রেতে ধরিল।
চন্দ্রগ্রহ নিরখিয়া স্নান দান কর গিয়া ইহা ছলে মনে পড়াইল॥
(উ. চ)

(খ) উদ্ভাসর—ভাবাবিষ্ট জনের দেহে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে উদ্ভাসর বলে। নীবীবন্ধ খসিয়া পড়া, উত্তরীবসন খসিয়া পড়া, ধম্মিল্লস্রংসন (কেশ এলাইয়া পড়া), গাত্রমোটন (নানারূপ অঙ্গভঙ্গি), জৃম্ভণ (হাই তোলা) ও ঘ্রাণের প্রফুল্লতা প্রভৃতি উদ্ভাসরের লক্ষণ।

(গ) বাচিক—বাচিক দ্বাদশ প্রকার। যথা,—

(১) আলাপ—চাটুপ্রিয় উক্তি।

(২) বিলাপ—দুঃখের বাণী।

(৩) সংলাপ—উক্তি প্রত্যুক্তি।

(৪) প্রলাপ—ব্যর্থ আলাপ।

(৫) অনুলাপ—বার বার উক্তি।

(৬) অপলাপ—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অন্য অর্থ আরোপন।

(৭) সন্দেশ—খবর।

(৮) অতিদেশ—তাহার উক্তিতেই আমার উক্তি এই প্রকার যে স্থানে বোঝান হয়, তাহাকে অতিদেশ বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ললিতা),—

যে কথা কহিলাম আমি সন্দেহ না কর তুমি এই বাক্য রাধিকার হয়।
আমি যন্ত্র তেঁতন্ত্রী রাধা তাতে হয় যন্ত্রী ইহাতে নাহিক বিপর্য্যয়॥
(উ. চ)

(৯) অপদেশ—বক্তব্য বিষয়ের অন্যার্থ কল্পনাকে অপদেশ বলে। উজ্জ্বলনীলমণি হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল, (শ্যামার প্রতি নান্দীমুখী),

দাড়িম তরু উজ্জল ধরিযাছে দুই ফল তাতে রেখা আছে বহুতর।
দুই পুষ্প বিকশিত তাহাতে করেছে ক্ষত বড়ই নিঠুর মধুকর॥

শ্যামা শুনি সখির বচন।

চমকিত হয়া ধনী অধরে ধরিল পাণি
বসনে আচ্ছাদে দুই স্তন॥ (উ. চ)

(১০) উপদেশ—

(১১) নির্দ্দেশ—'সেই আমি' এই প্রকার বলা;

(১২) ব্যপদেশ—ছল করিয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করা। উপরোক্ত বাচিক অনুভাবসকল সমস্ত রসেই সম্ভব, কিন্তু মধুর রসের পরিপূরক হিসাবে তাহাদের আলোচনা করা হইল।

সাত্ত্বিক ভাব—এইবার আমরা সাত্ত্বিক ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতে (দক্ষিণ ভাগ, তৃতীয় লহরী) সাত্ত্বিক ভাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপ করিয়া বলিতে

গেলে সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরায় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলে এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ভা:বের নাম সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব হইলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এইবার আলোচনা করিব।

(১) স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য ও বিষাদ এই চার প্রকার কারণে স্তম্ভ হয়।

(২) স্বেদ—হর্ষ, ভয় ও ক্রোধের জন্য স্বেদ হয়।

(৩) রোমাঞ্চ—আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ ও ভয় হেতু রোমাঞ্চ হয়।

(৪) স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, হর্ষ ও ভয় হেতু স্বরভেদ হয়।

(৫) বেপথু—বিষাদ, রোষ ও ভয়ে শরীরে কম্প হয়।

(৬) বৈবর্ণ্য—বিষাদ, রোষ ও ভয়ে দেহের বিবর্ণতা আসে।

(৭) হর্ষ অশ্রু—হর্ষ, রোষ ও বিষাদে চোখে জল আসে।

(৮) প্রলয় বা নিশ্চেষ্টতা—সুখ ও দুঃখ ইহার কারণ।

(৯) ধূমায়িতা—পূর্ব্বোল্লিখিত ভাব সকলের এক বা দুইয়ের সহিত মিলিত হইয়া ঈষৎভাবে প্রকাশিত হইলে, যদি তাহা গোপন করিবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে ধূমায়িতা বলে।

(১০) জলিতা—দুই বা তিন ভাব এক সময়ে মনে উদয় হইলে তাহা যদি কষ্টে গোপন করা যায় তাহা হইলে তাহাকে জলিতা বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—ধন্যার প্রতি সখী:

জানু দুই অচঞ্চল নেত্রে বহে অশ্রুজল
রোমগণ করিছে নর্ত্তন।
বুঝিলাম নীলবর্ণ অপূর্ব্ব পুরুষ রত্ন
পাইছ তুমি যে দর্শন॥ (উ. চ)

(১১) দীপ্তা—তিন, চার বা পাঁচটি ভাব যদি একসঙ্গে হৃদয়ে উদিত হয় এবং তাহা যদি সম্বরণ করা সম্ভব না হয় তবে তাহাকে দীপ্তা বলে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—শ্রীরাধার প্রতি বিশখা:

তোমার যে অশ্রুজল ভিজাইল ক্ষিতিতল
নিশ্বাসে নাচিছে অঙ্গবাস।
পুলকে দন্তুর অঙ্গ বুঝি কৃষ্ণ লীলারঙ্গ
তোমার শ্রুতিপটে কৈল বাস॥

(১২) উদ্দীপ্তা—পাঁচ, ছয় অথবা সমস্ত ভাব যদি একসঙ্গে হৃদয়ে উদয় হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তবে তাহাকে উদ্দীপ্তা বলে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি উদ্ধব :

নেত্রজলে কৈল স্নান স্বেদবিন্দু মুক্তাদাম
রোমাঞ্চতে অঙ্গ ঢাকা গেল।
গণ্ড হলো পাণ্ডুবর্ণ কণ্ঠে গদ্ গদ্ বর্ণ
এতভাবে রাধিকা ভাসিল॥
দেখ দেখ রাধার ভাবচয়।
উঠি সব ভাবগণ লজ্জা কৈল নিবারণ
কৈল সজ্জা স্তম্ভের আশ্রয়। (উ. চ)

উদ্দীপ্তার বিশেষ ভাবকে সুদীপ্তা বলা হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

পড়ে রাধার স্বেদ বারি তাহা পিয়ে ধেনু সারি
তাহাদের তৃষ্ণা দূরে গেল।
মুকুলিত লোম সারি দেখি কোকিলের নারী
তাহে মন লুব্ধ হইল॥
তোমার মুরলী শুনি স্তম্ভিত হইল ধনি
শুক্লবর্ণ সব অঙ্গ হল
সরস্বতীর প্রতিকৃতি সেই ভ্রমে মূঢ়মতি
বিদ্যার্থিরা নিকটে আইল॥ (উ. চ)

ব্যভিচারি ভাব—ব্যভিচারের আভিধানিক অর্থ অতি ব্যাপ্তি এবং ন্যায়দর্শন মতে ইহা "হেতুদোষ" বিশেষ বুঝায়। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ব্যভিচার ভাবের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
বাগঙ্গ সত্ত্ব সূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ॥ (দক্ষিণ বিভাগ, ৪র্থ লহরী)

অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব বিশেষরূপে এবং পরস্পরের সন্নিকটে স্থায়ী ভাবে বিচরণ করে তাহাদিগকে ব্যভিচার বলা হয়। যে ভাব, বাণী, অঙ্গ (ভ্রূ, নেত্রাদি) এবং সত্ত্ব (অর্থাৎ সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা সূচিত হয় তাহাকে

ব্যভিচার ভাব বলা হয়। সাগরের তরঙ্গ যেরূপ সাগরেই উৎপন্ন হইয়া সাগরের বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে লীন হয়, ব্যভিচারি ভাবসমূহও স্থায়ীভাবে উদ্ভব হইয়া, স্থায়ীভাব বৃদ্ধি করিযা আবার স্থায়ীভাবের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

ব্যভিচারি ভাব তেত্রিশ প্রকার। (১) **নির্ব্বেদ**—অত্যন্ত আর্ত্তি, বিয়োগ ও ঈর্ষায় নির্ব্বেদ বা আত্মাধিকার উৎপন্ন হয়।

(২) **বিষাদ**—ইষ্ট বস্তু না পাইলে এবং কাজে বিফল মনোরথ হইলে বিষাদ উপস্থিত হয়।

(৩) **দৈন্য**—দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধে দৈন্যের উৎপত্তি হয়।

(৪) **গ্লানি**—পরিশ্রম, মনের পীড়া ও রতি এই তিনে গ্লানি বা নির্ব্বলতা হয়।

(৫) **শ্রম**—শ্রম তিন প্রকার—পথশ্রম, নৃত্যশ্রম আর অতিশ্রম।

(৬) **মদ**—মধুপানে মদের উদ্ভব হয়।

(৭) **গর্ব্ব**—সৌভাগ্য, রূপ, গুণ এবং সর্ব্বোত্তমের আশ্রয় লওয়ার জন্য গর্ব্ব হয়। সৌভাগ্য-জনিত গর্ব্ব সম্পর্কে উজ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া আছে—

(শ্রীরাধার প্রতি বিশাখা)—

সখীগণ সঙ্গ ছাড়ি ছাড়ি সব ব্রজ নারী
কৃষ্ণ তোমার দুয়ারে দাঁড়াঞা।
কুন্তল রচিছ তুমি বার বার বলি আমি
হরি পানে চাহগো ফিরিঞা॥ (উ. চ)

(৮) **শঙ্কা**—চৌর্য্য, অপরাধ আর অপরের ক্রূরতা হইতে শঙ্কা হয়। চৌর্য-জনিত শঙ্কা সম্পর্কে উজ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে,—

কৃষ্ণ নিদ্রা গেল দেখি বাঁশী লৈয়া বিধুমুখী
লুকাইল লতার ভিতরে।
অঙ্গের যে ছটাগণ তমঃ করে বিনাশন
তাথে রাধা সভয় অন্তরে॥
রাধা করে বিধির নিন্দন।
হেন অঙ্গ মোর কৈল অন্ধকার দূরে গেল
বিধি নাহি বুঝে প্রিয়জন॥ (উ. চ)

(৯) **ত্রাস**—বিদ্যুৎ দেখিয়া বা ঘোরাকৃতি জন্তু দেখিয়া বা ঘোর শব্দ শুনিয়া ত্রাস হয়।

(১০) **আবেগ**—প্রিয় দৃষ্টি, প্রিয় শ্রুতি ও প্রিয় দরশনে আবেগ জন্মায়।

(১১) **উন্মাদ**—অত্যন্ত আনন্দে ও বিরহে উন্মত্ততা হয়। বিরহ অবস্থায় যে উন্মত্ততা হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া গেল—

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয়॥
খেনে আকুল খেনে থীর।
খেনে ধাবই খেনে গীর॥
খেনে খেনে হরি হরি বোল।
সহচরি ধরি করু কোর॥
ঐছন হেরি অগেয়ান।
সবহু দগধ করু প্রাণ॥
গুরুজন ভয়ে সখিমেল।
মন্দির মাঝাহিঁ নেল॥
তাথি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায়॥ ৪৪॥১৭৫॥ প. ক. ত

(১২) **অপস্মার**—দুঃখ হওয়ায় জীবনশক্তির বিকারের জন্য চিত্তের যে আকুলতা হয় তাহাকে অপস্মার বলে। আভিধানিক অর্থ মূর্চ্ছারোগ; কাব্যালঙ্কার মতে ভূতাদির আবেশ জন্য মনের বিকলতা (ভূপতন, কম্প, ঘর্ম্ম, ফেন, লালাদি ইহার জ্ঞাপক)। উজ্জ্বলনীলমণিতে অপস্মারের এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—(ললিতার উক্তি)—

বচনে প্রলাপ সার উদ্গত বচন তার লালা ফেন বদনে উদ্গার।
অন্তরে বিরহ বাধা ব্যাকুলা হয়েছে রাধা গুরুজনে কহে অপস্মার॥
(উ. চ)

(১৩) **ব্যাধি**—জ্বরাদি প্রতিরূপ বিকার।

(১৪) **মোহ**—হর্ষ, বিষাদ এবং কৃষ্ণবিরহে মোহ জন্মায়।

(১৫) **মৃতি**—মরণের উদ্যম। 'সমর্থ', সমঞ্জস ও স্থায়ী ভাববতী কৃষ্ণপ্রিয়াগণের নিত্যসিদ্ধত্ব হেতু মৃত্যু অসম্ভব।

"উদ্ধব-সন্দেশে" ললিতার প্রতি শ্রীরাধা—

যাবত অক্রুর রথে না চড়ায় প্রাণনাথে
তাবহ শুনহ মোর বাণী
আমি না বাঁচিব আর তোরে দিলাম কার্য্যভার
মনে করি, করি করি আমি ॥
এই যে মালতি লতা যার পুষ্প নব্য পাতা
গোবিন্দ পরিত নিজ কানে।
তুমি তাথে করি প্রীতি জল দিহ নিতি নিতি
যতন করি করিহ পালনে ॥ (উ, চ)

(১৬) **আলস্য**—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ও শ্রীকৃষ্ণবিষয় বস্তুর প্রতি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের কোনরূপ আলস্য হইতে পারে না। ক্রম অনুসারে ইহা এইখানে উল্লেখ করা গেল।

(১৭) **জাড্য**—অঙ্গশৈথিল্য—ইষ্টানিষ্ট শ্রবণ ও ইষ্টানিষ্ট দরশনে অঙ্গ শৈথিল্য হয়। ইষ্টশ্রবণজনিত জাড্য সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। (নান্দীমুখী প্রতি কুন্দবল্লী)—

হরির নূপুর দুয়ারে বাজিছে তাহা শুনি শশীমুখী।
চলে যেতে চাহে চলিতে না পারে মনে হলো বড় দুঃখী ॥ (উ. চ)

(১৮) **ব্রীড়া**—নবসঙ্গমহেতু এবং অন্যায় আচরণ, স্তুতি ও অবজ্ঞা হইতে ব্রীড়ার উদ্ভব হয়।

(১৯) **অবহিত্থা**—অবহিত্থা অর্থ আকার গোপন করা। ইহা কপটতা করিয়া করা যায়; আবার লজ্জা করিয়াও আকার গোপন করা যায়, আবার দাক্ষিণ্য করিয়াও আকার গোপন করা যায়, লজ্জা ও ভয় একসঙ্গে হইলেও অবহিত্থা হয়। শুধু ভয়েও হয়, আবার গৌরব ও দাক্ষিণ্য একসঙ্গে হইলেও অবহিত্থা হয়। শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে কপটতা হেতু যে অবহিত্থা হয় তাহার উদাহরণ শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দিয়াছেন, সেই উদাহরণটি এইখানে দেওয়া গেল—(শশিমুখীর প্রতি মদনিকা)

সেই ব্রজরাজপুত্র কালিন্দী তীরের ধূর্ত্ত
তার বার্ত্তা না কহ আমারে।
এযে নাচে রোমচয় এ মোর পুলক নয়
হিমের পবনে শীত করে ॥ (উ. চ)

(২০) **স্মৃতি**—(১) সাদৃশ্যের দরশন হেতু ও (২) অতিশয় অভ্যাস হেতু স্মৃতি হয়।

(২১) **বিতর্ক**—পরম সংশয় হইলে তাহাকে বিতর্ক বলে।

(২২) **চিন্তা**—ইষ্টের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি চিন্তার কারণ বলিয়া গণ্য হয়। পদ্যাবলী হইতে উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৃত ইষ্টাপ্রাপ্তির উদাহরণ—পূর্ণমাসীর উক্তি :

'গোবিন্দের দুই আঁখি অধিক চঞ্চল দেখি
নিশ্বাস বহিছে খরতরি।
কেমন সে রমণী বশ কৈল ব্রজমণি
তাহাকেই চিন্তা করে হরি॥ (উ. চ)

(২৩) **মতি**—শাস্ত্রাদির বিচার জনিত অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি বলে। পদ্যাবলী হইতে উজ্জ্বলনীলমণিতে মতি সম্বন্ধে যে উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই শ্লোকটি স্বয়ং মহাপ্রভুর উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই বিরহ যন্ত্রণা দেওয়া ইহা পূর্ণমাসী শ্রীরাধাকে বলিলে শ্রীরাধার প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলিলেন :—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

আলিঙ্গন করে মোরে আদর করিয়া।
পদ প্রান্তে রহি যবে না দেখে চাহিয়া॥
দরশন নাহি দিয়া করে বা-কাতর।
অথবা মজিয়া রহে লইয়া অপর॥
তথাপি আমার নাথ সেই জন হয়,
নন্দ সুত বিনা আর প্রিয় কেহ নয়॥

(২৪) **ধৃতি**—দুঃখাভাব ও উত্তম প্রাপ্তি হেতু মনের যে স্থৈর্য্য তাহাকে ধৃতি বলে।

(২৫) **হর্ষ**—অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভেতে হর্ষ হয়।

(২৬) **ঔৎসুক**—ইষ্ট দৃষ্টির ইচ্ছা ও ইষ্ট প্রাপ্তির জন্য উৎসাহে কাল

(২৭) **উগ্রতা**—উগ্রতা সাধারণ অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয় না সেজন্য উহা মুগ্ধাদিতে দেখান হইতেছে।

(২৮) **অমর্ষ**—অধিক্ষেপ অর্থাৎ তিরস্কারও অপমানে অমর্ষের স্থিতি হয়।

(২৯) **অসূয়া**—পর সৌভাগ্যে ঈর্ষা।

(৩০) **চাপল**—চিত্তের লঘুতা হেতু অগাম্ভীর্য্য।

(৩১) **নিদ্রা**—ক্লান্তি হেতু নিদ্রার উৎপত্তি।

(৩২) **সুপ্তি**—বিবিধ চিন্তান্বিত এবং নানা বস্তুর অনুভবময় নিদ্রাকে সুপ্তি বলে। ইন্দ্রিয়গণের অপরতি, শ্বাস এবং চক্ষুর্মুদ্রণ প্রভৃতি তাহার অনুভাব। উজ্জ্বলনীলমণিতে সুপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

পথ ছাড চঞ্চল যাব যমুনার জল এই বাক্য কহিয়া স্বপনে।
গোবিন্দের ভুজ লঞা তাথে নিজ শির দিযা রাধা নিদ্রা যায কুঞ্জ ভবনে ॥

(উ. চ)

(৩৩) **বোধ**—অবিদ্যা, মোহ, এবং নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত যে জ্ঞানের উদয় হয তাহাকে বোধ বলে।

ব্যভিচারি প্রকরণে চারপ্রকার দশার কথা উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত হইয়াছে—

(১) **উৎপত্তি**—ভাবের সম্ভাবকে উৎপত্তি বলে।

(২) **সন্ধি**—সমানরূপ বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সংমিশ্রণকে সন্ধি বলে।

(৩) **শাবল্য**—ভাবসমূহের উত্তরোত্তব পরস্পররের মিশ্রণকে শাবল্য বলে।

(৪) **শান্তি**—ভাবের লয। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইযাছে। সখি প্রতি নান্দীমুখী—

সখীবাক্য পরচার সেই মহাকুঠার তাথে যার না হৈল ছেদন।
দূতীবাক্যে বহুতর সেই নদী নির্ঝর তাথে যার না হৈল উন্মূলন।
দেখ, কৃষ্ণ-বাঁশীর মাধুরী।
সে কমলার মান-বৃক্ষ তাহা উপাড়িতে দক্ষ হেন বাঁশী পবন-লহরী ॥

(উ. চ)

স্থায়িভাব বা মধুর রতি—শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী) স্থায়িভাবের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যাহা হাস্যাদি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদি

বিরুদ্ধ ভাবকে বশগত করিয়া স্বরাজার ন্যায় বিরাজমান হয় তাহাকেই স্থায়িভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে রতি, ভক্তিশাস্ত্রে তাহাকেই স্থায়ীভাব বলা হইয়াছে। এই রতি দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রিয়তা এই পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। গৌণ রতি আবার হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা ইত্যাদি সাত প্রকার। মুখ্যরতি ও গৌণ রতি যে পর্য্যন্ত না রসাবস্থা প্রাপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত স্থায়িভাব বলা হয়।

অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব প্রভৃতি কারণে রতির আবির্ভাব হয়, উক্ত কারণসকলের মধ্যে অভিযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বভাব পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

(১) **অভিযোগ**—নিজে অথবা অন্যের দ্বারা স্বীয ভাবের প্রকাশকে অভিযোগ বলা হয।

(২) **বিষয়**—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটিকে বিষয় বলা হয়।

(ক) শব্দ—প্রিয়তমের শব্দ শুনিয়া যে রতির সঞ্চার হয় তাহার উদাহরণ—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই-কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিছিব আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায় বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণি॥

(শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস)

(খ) স্পর্শ—স্পর্শ-জনিত রতির যে হেতু তাহার উদাহরণ—

আলো সই, কি হইল মোরে প্রেমজ্বালা।
মো যেন আপনা খাইলুঁ কেনে বা যমুনা গেলুঁ
শয়নে স্বপনে দেখোঁ কালা॥

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে নানা আভরণ রঙ্গে
সাধে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাট সেখানে ভুলিলু বাট
কালা মেঘে ঝাপ্যাছিল মোরে ॥
যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব আছে
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে আচাম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল বেথা ॥
সে কালা কালিয়া শ্যাম কালিয়া তাহার নাম
কালিন্দী কদম্ব তলে থানা।
বংশীবদনে কয় যুবতী জীবার নয়
দেখিলে মরমে দেয় হ'না ॥৫॥ ১২১, প. ক. ত

(গ) রূপ—রূপ হেতু যে রতি তাহার উদাহরণ—

(১) ... ...

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
... ...

জ্ঞানদাস ॥৭॥ ১২৩ প. ক. ত

(২) ... ...

অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিলু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে লোম লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
উরুর বলনি রাম কদলী
তমাল জিনিয়া আভা ॥

চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥২২॥ ১৫৩, প. ক. ত

(ঘ) রস—রস হেতু যে রতির উদ্গম হয় উজ্জ্বল নীলমণিতে তাহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

(সখীবাক্য)
অঙ্গ হৈল পুলকিত তনু যেন বিগলিত তরঙ্গিত হৃদয় হইল।
রাধার এমন দেখি মনে অনুমানি সখী ললিতারে কহিতে লাগিল॥
আমি ইহার বুঝিলাম কারণে।
কৃষ্ণের অধরামৃত তাম্বুলের চর্ব্বিত তুমি দিলে রাধার বদনে॥
(উ. চ)

(ঙ) গন্ধ হইতেও রতির উৎপত্তি হয়।

(৩) **সম্বন্ধ**—কুল, রূপ, শৌর্য্য, শীল ও গুণ প্রভৃতি সমগ্র বিষয়ের আধিক্যকে সম্বন্ধ বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে সম্বন্ধের এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

কে বর্ণিবে বল তাথে গিরি ধরে বাম হাতে রূপ ত্রিভুবনের মোহন।
জন্ম ব্রজরাজ ঘরে গুণ লেখা কেবা করে লীলা চমৎকারের কারণ॥
সখি, হেন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন
তাহার মুরলী শুনি হেন কে রমণীমণি যে করয়ে ধৈর্য্য ধারণ॥
(উ. চ)

শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য ও রূপাদিতে যদি মন আকৃষ্ট না হইয়া থাকে তবে সেই মুরলীধরের মুরলী শুনিলে তাঁহার গুণাদির কথা মনে হইয়া পুনরায় তাহার প্রতি রতি হয়।

(৪). **অভিমান**—পৃথিবীতে অনেক রমণীয় বস্তু আছে, কিন্তু একটি বিশেষ বস্তু আমার একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া নিশ্চিত হওয়াকে অভিমান বলে। মমতার যে আস্পদ তাহার প্রতি অনন্যমন হইবার যে সংকল্প তাহাকেই অভিমান বলা হয়। এই যে অভিমান তাহা রূপ ও গুণের অপেক্ষা না করিয়া

রতি বৃদ্ধি করে। অভিমানের উদাহরণ—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতুলী
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বন্ধু বিনু
আর কেহো মোর নয়॥

... ...
.. .. জ্ঞানদাস ॥১০০॥৮৯৮॥ প. ক. ত

(৫) **তদীয় বিশেষ**—শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, বৃন্দাবন, আর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন। এইরূপ বস্তু দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি রতি হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যে কোন নববধূকে শ্রীরাধার সঙ্গ করিতে বারণ করা হইয়াছিল। কারণ উক্ত নববধূর শাশুড়ী মনে করিতেন শ্রীরাধা উন্মত্তা হইয়াছেন। কিন্তু সেই নববধূ শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইলেন এবং তখন হইতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে রতি হইল; তাই তিনি বলিলেন—

রাধারে দেখিতে মোর সখিজন নিবারিল বারে বার।
তথাপি রাধারে দেখিলাম আমি সকল মাধুরী সার॥
সেই দিন হতে তৃষিত নয়নে চারিদিক পানে চাই।
শ্যামল বরণ একটি পুতুল তাহাতে দেখিতে পাই॥
(উ. চ)

(৬) উপমা—এক বস্তুর সঙ্গে অপর কোন বস্তুর সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাকে উপমা বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সামান্য সাদৃশ্য যে বস্তুতে আছে তাহাতেই রতি বৃদ্ধি হয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে;—

কৃষ্ণ তুল্য মেঘ-লেখা ইন্দ্রধনু শিখিপাখা বিদ্যুৎ হয়েছে পীতাম্বর।
সে মঘ দেখিয়া ধনি নয়নে বহিছে পানি ভাবে অঙ্গ হৈল স্থিরতর॥
(উ. চ)

(৭) স্বভাব—স্বতই যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই স্বভাব। স্বভাব দুই প্রকার, (ক) নিসর্গ ও (খ) স্বরূপ। দৃঢ় অভ্যাস জন্য যে সংস্কার তাহাকে অভ্যাস বলে। সংস্কার ও অভ্যাস বশত শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণে যে উদ্দীপনা হয় তাহা শ্রেষ্ঠ নহে। কোন কারণ ছাড়া রতিউৎপাদক বস্তুবিশেষকে স্বরূপ বলে। স্বরূপ তিন প্রকার, (অ) কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ—দৈত্য ব্যতীত অন্যান্য ভক্তগণ কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—(নারীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বিদ্যা চারিনী দেবীগণের উক্তি)

এ নহে গোপনারী হরি বধূবেশ করি সুরনারীর মন কৈল চুরি।
রবি বিনে অন্ধকার বিনাশিতে শক্তি কার অতএব জানিল বটে হরি॥

(উ. চ)

(আ) ললনানিষ্ঠ স্বরূপ—ললনানিষ্ঠ স্বরূপ স্বযং উদ্দীপনত্ব প্রাপ্ত হয় যে হেতু ঐ স্বরূপ জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন অথবা গুণ শ্রবণ না করিয়াও তাহাতে অতি দ্রুত গাঢ় রতি করিয়া থাকে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওযা হইযাছে—(দর্শনাদির পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণকে অনুভাব করিয়া সখী প্রতি শ্রীরাধিকা)

নাহি দেখি নাহি শুনি হেন যে পুরুষমণি
মোর মন করে সম্ভাবন।
ঘনশ্যাম পীতাম্বরে সঙ্কল্প করিযা তারে
বৃথাই ঘুরযে মোর মন॥

(উ. চ)

(ই) শ্রীকৃষ্ণ ও ললনা এই দুইযের পরস্পর স্বরূপ এককালীন যাহাতে লব্ধ হয় তাহার নাম 'উভয়নিষ্ঠ'।

বিলাসের আধিক্যের জন্য রূপ, গুণ অনুভবাদি উদ্দীপন সকল আলোচনা করা গেল। কিন্তু ব্রজসুন্দরীদের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি তাহা স্বভাবসিদ্ধ রতি।

এই রতি তিন প্রকার—(ক) সাধারণী, (খ) সমঞ্জসা ও (গ) সমর্থা। (ক) সাধারাণী—যে রতি প্রায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে জন্মায়, কিন্তু অতিশয় গাঢ় হয় না এবং সম্ভোগ ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ। এই রতিও অত্যন্ত সুলভ নহে; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জার যে রতি তাহাই সাধারণী রতি (খ) সমঞ্জসা

—যাহাতে পত্নীত্বাভিমান বৃদ্ধি হয়, যাহা রূপ ও গুণ শ্রবণে জন্মায় এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগের তৃষা জন্মায় তাহাকে সমঞ্জসা রতি বলে। রুক্মিনী প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রতি তাহাই সমঞ্জসা রতি (গ) সমর্থা—সাধারণী এবং সামঞ্জসা হইতে বিশেষ সম্ভোগের ইচ্ছা যে রতিতে অর্থাৎ যে রতিতে নায়ক ও নায়িকার একীভাব প্রাপ্ত হয় তাহাকে সমর্থা রতি বলে। সমর্থা রতির যদি উদ্ভব হয় তবে কূল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লজ্জা প্রভৃতি কিছুই মনে থাকে না এবং সমর্থা রতি হইলে আর ভাবান্তর হইতে পারে না। এই সমর্থা রতি জগতে সুদুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজের গোপীর যে রতি তাহাই সমর্থা রতি। ব্রজের গোপীদের একমাত্র কাম্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ, সেইজন্য সমর্থা রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমর্থা রতি যে প্রেয়সীতে উদ্ভব হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার যেরূপ গাঢ় প্রেম জন্মায়, শ্রীকৃষ্ণেরও সেই প্রেয়সীতে ঠিক সেই জাতীয় প্রেম জন্মায়। উজ্জ্বলনীলমণিতে রতির তিন প্রকার ভাগ করিয়া কুব্জার, কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের এবং ব্রজগোপীদের রতির তারতম্য দেখান হইয়াছে। কিন্তু যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি যে রতি তাহা বিশ্লেষণ করা যায় তবে তাহা সাধারণী বা কুব্জার রতি হইতে অভিন্ন মনে হয়। আবার বিদ্যাপতি যে রাধিকার কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা সাধারণী ও সামঞ্জস এই উভয়বিধ রতির পরিচয় পাই। উজ্জ্বলনীলমণির পরবর্তী যুগে যে বৈষ্ণবরস সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে অবশ্য ব্রজগোপীগণের, বিশেষ করিয়া শ্রীরাধিকার রতি সামর্থা রতি বলিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। রতি দৃঢ় হইলে প্রেম হয়, প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মান, মান হইতে প্রণয়, প্রণয় হইতে রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ এবং অনুরাগ হইতে ভাব হয়। ভাবের নির্য্যাস মহাভাব, বিমুক্তভক্তগণ এই মহাভাবের জন্য আকাঙ্খিত হন।

স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোদ্যন্ স্নেহ ক্রমাদয়ং।
স্যান্মনঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥ ৪৪
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ সগুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা স চ সা যথাস্যাৎ সিতোপলা।
অতঃ প্রেম বিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়স্তেঽমী প্রেম শব্দেন সূরিভিঃ ॥ ৪৫

উ. নী ১৪শ অধ্যায়।

যেমন ইক্ষুর দণ্ডের বীজ বপন করিলে যথাকালে ইক্ষুদণ্ড হয়, তারপর রস, তারপর গুড়, গুড়ের পর খণ্ড, খণ্ডের পরে চিনি, চিনির পরে সিতা (মিছরি), মিছরি পরে সিতোপলা (ওলা) হয়, সেইরূপ রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ এবং অনুরাগ হইতে মহাভাব প্রভৃতি ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ প্রেমের বিলাস হেতু স্নেহাদি ছয়টি ভাবকে প্রায়শঃই প্রেম শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(১) প্রেম—নায়ক ও নায়িকার যে ভাব ধ্বংসের কারণসত্ত্বেও ধ্বংস হয় না তাহাকে প্রেম বলে।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাব বন্ধনং যুনোঃ সপ্রেমো পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ উ. নী ১৪শ অঃ, ৪৬।

যথা, ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরিত ॥
ঘরে পরে কিনা বলে করিব হাম কি।
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী।

চণ্ডীদাস ॥ ৮৮॥৮৮৬॥ প. ক. ত

প্রেয়সী সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম তিন প্রকার ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। (ক) প্রৌঢ় প্রেম—নায়িকার সহিত মিলনের যে সময় নির্দ্দিষ্ট করা ছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে নায়িকার নিকট উপস্থিত না হইতে পারিলে সেই বিলম্বের জন্য নায়িকার মনোভাব অজ্ঞাত থাকিলে নায়কের মনে যে ক্লেশ হয় তাহাকে প্রৌঢ় প্রেম বলে। (খ) মধ্য প্রেম—যে প্রেম অন্য নায়িকার অনুভব সহ্য করে তাহাকে মধ্য প্রেম বলে। চন্দ্রাবলীর সহিত সম্ভোগরত শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত রাধার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। এখানে চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মধ্য প্রেম। (গ) মন্দ প্রেম—সর্ব্বদা আত্যন্তিক রূপে পরিচিত থাকিলেও যে প্রেম অন্য কান্তাকে উপেক্ষা বা অপেক্ষা করে না তাহাকে মন্দ প্রেম বলা হয়। ব্রজভূমিতে মন্দ প্রেমের উদাহরণ অসম্ভব। এই প্রকার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বিষয়ক। প্রেয়সীদিগেরও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রেমের তারতম্য আছে, তাহা এখন আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে (ক) প্রৌঢ় প্রেম—যে প্রেমে বিচ্ছেদ সহ্য করা যায় না সেই প্রেম প্রৌঢ় বলিয়া মনে করা হয়। যথা শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি সখীর উক্তি—

মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ।
চীতহিঁ তোহারি এ দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সে বরনারী।
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি॥

গোবিন্দ দাস॥১২॥৩১৫॥ প. ক. ত

(খ) মধ্য প্রেম—যে প্রেমে অতি কষ্টে সহিষ্ণুতা হয় তাহাকে মধ্য প্রেম বলে। মন্দ প্রেম সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণিতে এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সখীর প্রতি কোন যূথেশ্বরী—

এইত দীঘল দিন কখন হইবে ক্ষীণ সন্ধ্যাকাল হইবে কখন।
তাহাতে কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া পাইব সুখ বনে হইতে আসিবে যখন॥ (উ.চ)

(গ) মন্দ প্রেম—কদাচিৎ যে প্রেম বিস্মরণ হয় তাহাকে মন্দ প্রেম বলে। উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সখীর প্রতি কোন যূথেশ্বরী—

এলে প্রতিপক্ষ নারী তার প্রতি ঈর্ষা করি পাশরিলাম মালার গ্রন্থন।
কি করিব সহচরী ঐ পারা এলে হরি হাম্বারব করে ধেনুগণ (উ, চ)

(২) স্নেহ—যে প্রেম পরম উৎকর্ষে আরোহণ করিয়া বিষয় উপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহার নাম স্নেহ। স্নেহ তিন রকম (ক) অঙ্গ সঙ্গে মনোদ্রব (খ) অবলোকনে মনোদ্রব এবং (গ) শ্রবণ হেতু মনোদ্রব।

স্নেহ আবার দুই প্রকার (অ) ঘৃতস্নেহ আর (আ) মধুস্নেহ। (অ) ঘৃতস্নেহ —যে স্নেহ অতিশয় আদরময় তাহাকে ঘৃতস্নেহ বলে। ঘৃতস্নেহ ভাবান্তরের সহিত মিলিত হইলে স্বাদু হয় কিন্তু স্বয়ং হইতে পারে না। (আ) মধুস্নেহ —তুমি আমারই ইত্যাদি বিষয়ে স্নেহ তাহার নাম মধুস্নেহ। যাহার মাধুর্য্য অন্য কোন বস্তুর সহযোগীতার অপেক্ষা করে না এবং যাহাতে সূক্ষ্মরূপে নানা রসের অবস্থিতি আছে তাহাকে মধুস্নেহ বলে।

(৩) মান—(ক) উৎকর্ষ লাভ করিয়া যে স্নেহ নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং কুটিলতা ধারণ করে তাহাকে মান বলে।

স্নেহস্তুৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ উ. নী. ১৪শ অঃ, ৭১।

উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধা—

তোমার সুরভি যায় পথে ধূলি উড়ে তায়
সেই ধূলি নয়নে লাগিল।
তাতে মোর আঁখি ঝুরে মুখানিলে কিবা করে
ইহা বলি ভুরু বাঁকাইল ॥ (উ. চ)

যেখানে প্রণয় সেইখানেই মান। কখনও স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া প্রণয় হয় আবার কখনও বা স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া মান হয়। শেষোক্ত প্রকার মানে নায়িকা ও নায়ক একত্র থাকিলে এবং প্রণয়ের গভীরতা সত্ত্বেও আলিঙ্গনাদি হইতে নায়িকা বিরত থাকেন। আপাত দৃষ্টিতে নায়িকা নায়কের প্রতি বিমুখিতা প্রদর্শন করিলেও নায়কের প্রতি তাহার অকপট ও গভীর প্রণয় থাকে। এইরূপ মান বিপ্রলম্ভের ভিতর ধরা হইয়াছে। নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, গর্ব্ব, অসূয়া, ভাবগোপন, গ্লানি ও চিন্তা প্রভৃতি এই প্রকার মানের লক্ষণ। পদাবলী সাহিত্যে এই প্রকার মানই স্থান পাইয়াছে। যথা—

তোহারি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বুল
ধরলহুঁ রাইক আগে।
কোপে কমল-মুখি পালটি না হেরল
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥
তোহারি নাম শুনয়ে যবে সুন্দরি
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরিতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী ॥

বিদ্যাপতি ॥১৬॥৫০০॥ প. ক. ত

মান দুই প্রকার (ক) উদাত্ত ও (খ) ললিত।

(৪) প্রণয়—মান বিশ্রম্ভ ধারণ করিলে তাহাকে প্রণয় বলে। বিশ্রম্ভ অর্থে সম্ভ্রমের বোধরহিত অবস্থা বুঝায় অর্থাৎ স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়তমের প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দেহের সহিত যখন ঐক্য ভাব হয়। এই বিশ্রম্ভ দুই প্রকার (অ) মৈত্র অর্থাৎ যেখানে বিনয় সূচিত হইতেছে এবং (আ) সখ্য যেখানে ভয়শূন্যতা সূচিত হইতেছে।

"মানো দধান বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ"—উ. নী. ১৪শ অধ্যায়।

(৫) রাগ—প্রণয়ের উৎকর্ষের জন্য যেখানে চিত্তে অতিশয় দুঃখ ও সুখ বলিয়া অনুভূত হয় তাহার নাম রাগ। উজ্জ্বল নীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে : (সখীগণ প্রতি ললিতা)—

সূর্য্যের কিরণে তপ্ত সূর্য্যকান্ত মণি যত তাথে অদ্রিতট ক্ষুরধার।
তাহাতে দাঁড়াঞা রাধা না জানে মনের বাধা দেখে কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য অপার॥
দেখ, রাধার প্রেমের মাধুরী।
ইন্দীবর সূর্য্যপরি যেমন চরণ ধরি অচঞ্চল রহিলা সুন্দরী। (উ. চ)

রাগ দুই প্রকার (ক) নীলিমা ও (খ) রক্তিমা। (ক) নীলিমা রাগ—যে রাগের ব্যয় সম্ভাবনা নাই, যাহা বাহ্যে অত্যন্ত প্রকাশ পায় এবং স্বলগ্ন ভাবকে আবরণ করে তাহাকে নীলিমা রাগ বলা হয়। এই রাগ চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণে দেখা যায়। (খ) রক্তিমা রাগ—রক্তিমা রাগ আবার (অ) কুসুম্ভ ও (আ) মাঞ্জিষ্ঠ সম্ভব এই দুই ভাগে বিভক্ত। (অ) যে রাগ অতি শীঘ্র চিত্ত মধ্যে আসক্ত হয় এবং অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া যথোচিত শোভা পায় তাহাকে কুসুম্ভ রাগ বলে। (আ) যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না এবং অন্যকেও অপেক্ষা করে না, কিন্তু সর্ব্বদা নিজের কান্তি দ্বারা বাড়িতে থাকে তাহাকে মাঞ্জিষ্ঠ রাগ বলে—যেমন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের রাগ।

(৬) **অনুরাগ**—যে রাগ নূতন নূতন হইয়া অনুভূত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নূতন করিয়া অনুভব করায়, তাহাকেই অনুরাগ বলা হয়।

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নব নবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥"
(উ. নী. ১০২, ১৪শ অধ্যায়)

যথা, সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু রাগ বাখানিয়ে
অনুখণ নৌতুন হোয়॥ ধ্রু॥
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা॥

বচন-অমিয়া রস অনুখণ শুনলু
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লু
না বুঝলু কৈছন কেলি ॥ কবিবল্লভ ॥১৩৯॥৯৩৭॥প. ক. ত

(৭) **ভাব**—প্রিয়তমকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া অনুরাগ যদি প্রবলভাবে প্রকটিত হয় তবে তাহাকে ভাব বলা হয়।

অনুরাগঃ স্বয়ং বেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়া বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥

উ. নী. ১০৯, ১৪শ অধ্যায়।

এই ভাব কেবলমাত্র ব্রজ সুন্দরীতেই সম্ভব এবং ইহার নির্য্যাস মহাভাব। মহাভাব হইলে সাত্ত্বিক ভাব সকল বিশেষরূপ উদ্দীপ্ত হয়। মহাভাবের যে অবস্থায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাবসকলের উদয় হয় তাহাকে 'মোদন' বলা হয়। এই অবস্থাই প্রেমের শ্রেষ্ঠ অবস্থা ; এইরূপ অবস্থা কেবলমাত্র শ্রীরাধার যূথেতেই সম্ভব এবং এই মোদনই হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ বিলাস।

রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্ব্বতঃ।
যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনী শক্তেঃ সুবিলাস প্রিয়োবরঃ।

উ. নী. ১২৮, ১৪শ অধ্যায়।

এই মোদন ভাব উদ্দীপন হইলে যখন প্রিয়তমের সহিত বিচ্ছেদ হয় তখন নায়িকার মোহন অবস্থা হয়। বিরহের জন্য বিহ্বলতা হওয়ায় মোহন অবস্থায় সাত্ত্বিক ভাবসকল সুষ্ঠুরূপে দীপ্তি পাইয়া থাকে।

মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥

উ. নী. ১৫০, ১৪শ অঃ।

এই মোহনভাব হইলে (১) কান্তা আলিঙ্গন অবস্থাতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা হয় অর্থাৎ কোন মহিষী কর্ত্তৃক আলিঙ্গন লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার কথা মনে হয় এবং শ্রীরাধার আলিঙ্গনে যে সুখানুভূতি হয় তাহার কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, (২) অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সুখের কামনা, (৩) ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকারিতা, (৪) পাখীদের সমবেদনায় আকুল ক্রন্দন, (৫) মৃত্যু স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিবার তৃষ্ণা, এবং

(৬) দিব্যোন্মাদাদি বহু প্রকার অনুভাব হয়। একমাত্র বৃন্দাবনেশ্বরীতেই এই মোহন ভাব প্রকাশ পায়।

অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্য দুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনং।
স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গ তৃষ্ণা মৃত্যু প্রতিশ্রবাৎ॥
দিব্যোন্মাদাদয়োপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ।
প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোয়মুদঞ্চতি॥
সম্যগ্বিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারি মোহতঃ॥

উ. নী. ১৩২, ১৪শ অধ্যায়

দিব্যোন্মাদ—আমরা মোহনভাবের অনুভাব স্বরূপ দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিব। মনের যে ধর্ম্মের কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না বা গুণ বলা যায় না সেইরূপ মনোধর্ম্মের ভ্রান্তি সদৃশ চমৎকার দশা হইলে তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলা যায়। এই দিব্যোন্মাদে উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি বহু বহু ভেদ হইয়া থাকে।

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদঘূর্ণা চিত্তজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥
... ...

উ. নী. ১৩৭ শ্লোঃ ১৪শ অধ্যায়

আমরা এখানে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদের একটি উদাহরণ দিতেছি, যথা—

সজনী অদভুত প্রেম উনমাদ।
ঐছন নব ভাব দেখি ভকত সব
ভাবহি করত বিষাদ॥ ধ্রু॥
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে হাসত
বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ।
নয়নকনীর ঢরকত ঝর ঝর
যৈছন গঙ্গ-তরঙ্গ॥

অনিমিখ নয়নহি নিরখই দশ দিশ
ছোড়ত দীর্ঘ নিশ্বাস।
যাচে রাধামোহন সো পদ অনুখন
হোয় জনু বর অভিলাষ॥ ৪২॥১৭৩ প. ক. ত।

(১) **উদঘূর্ণা**—নানারূপ বিপরীত আকুলতার চেষ্টাকে উদঘূর্ণা বলে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রতি উদ্ধব—

কখন বা কুঞ্জগৃহে বাস-সজ্জা করি রহে বলে, পাব কৃষ্ণ দরশন।
দেখি নব জলধরে মানের আচার করে করে বহু তর্জ্জন গর্জ্জন॥
দেখি রাতি অন্ধকার কভু করে অভিসার হয় বহু সম্ভ্রম অপার।
অন্তরে বিরহজ্বর অঙ্গসব জর জর রাধা করে কত ব্যবহার॥
(উ. চ)

(২) **চিত্রজল্প**—প্রিয়তমের কোন বন্ধুর সহিত দেখা হইলে, নায়িকা অত্যন্ত ক্রোধ বশত যে সমস্ত ভাবময় বাক্য বলেন তাহাকে উদঘূর্ণা বলে। এই সমস্ত বাক্যের ভিতর দিয়া প্রিয়তমের প্রতি নায়িকার উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পায়। এই চিত্রজল্পের অঙ্গ দশ রকম (ক) প্রজল্প (খ) পরিজল্প (গ) বিজল্প (ঘ) উজ্জল্প (ঙ) সংজল্প (চ) অবজল্প (ছ) অতিজল্প (জ) অভিজল্প (ঝ) প্রতিজল্প এবং (ঞ) সুজল্প।

মাদন—হ্লাদিনীর সার প্রেম, ঐ প্রেম যদি রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবের উদ্দীপনের সহায়ক হয় এবং এই সমস্ত ভাবের উদ্দীপনার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে তাহাকে মাদন বলে। এই মাদন মোহনাদি ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ। এই মাদন সর্ব্বদা শ্রীরাধিকাতেই বিরাজিত থাকে অন্য কোথায়ও ইহা দেখা যায় না। মদ্ ধাতু অর্থ হর্ষ অর্থাৎ সমস্ত জগতের হর্ষপ্রদ এইজন্য অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত এবং সেই মহাভাব :—

সর্ব্ব ভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥
উ. নী. ১৪শ অধ্যায়, ১৫৫ শ্লোক

এই মাদন রসে ঈর্ষার অযোগ্যতাতেও অর্থাৎ চেতনাশূন্য বস্তুতে ঈর্ষার ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকিলেও তাঁহার গন্ধ যে আধারে আছে তাহার স্তব করায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ কালে এই মাদন অতি

বিচিত্র হয় এবং বহু প্রকার নিত্যলীলার কারণ হয়। এই মাদনের যে গতি ও বিকাশ তাহা স্বয়ং মদনের নিকট দুর্ব্বোধ্য।

শৃঙ্গার রস—আমরা এতক্ষণ স্থায়ীভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এইবার আমরা শৃঙ্গার, বা উজ্জ্বল বা মধুর রসের আলোচনা করিব।

তদেবং মধুর রত্যাখ্যং ভাবমুক্তা শৃঙ্গার পর্য্যায মধুররসমাহ।

—শ্রীজীবগোস্বামী

(১) বিপ্রলম্ভ ও (২) সম্ভোগ ভেদে উজ্জ্বলরস দুই প্রকার।

(১) বিপ্রলম্ভ—আলঙ্কারিকদের মতে অতিশয় অনুরক্ত যুবক ও যুবতীর অসমাগমন নিমিত্ত রতি ভাব যখন উৎকৃষ্ট হয় কিন্তু অভীষ্ট লাভ করিতে পারে না, তখন তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলা হয়। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের উন্নতির কারণ। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপগোস্বামী বিপ্রলম্ভের পরিশোধিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নায়ক ও নায়িকা অযুক্ত এবং সময়ে পরস্পর অভিমত আলিঙ্গন চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয় তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে, এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।

যুনোরযুক্তয়ো র্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যোমিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সংভোগোন্নতিকারকঃ॥

উ. নী. ১৫শ অধ্যায় ৩ শ্লোক

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্র্য এবং প্রবাস ভেদে বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার।

(১) পূর্ব্বরাগ—সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন, এবং শ্রবণাদির দ্বারা যে রতি উৎপন্ন হয় এবং নায়ক ও নায়িকার উভয়েরই বিভাবাদির মিশ্রণে যে বিশেষ উপভোগ রসের সৃষ্টি হয় তাহাই পূর্ব্বরাগ।

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

উ. নী. ৫ শ্লোঃ, ১৫শ অধ্যায়

দর্শন-জনিত পূর্ব্বরাগের উদাহরণ—

(অ) সাক্ষাৎ দর্শন। কিরূপ দেখিনু মধুর মুরতি
পিরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার॥ দ্বিজ ভীম ॥৭॥৩৪ প. ক. ত

(আ) চিত্রপটে দর্শন। হাম যে অবলা হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি
বিরলে বসিয়া পটেত লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি ॥
হরি হরি এমন কেন বা হৈল।
বিষম বাড়ব আনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল ॥ ধ্রু ॥
বয়স কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন-যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন সে হেন আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নব-রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥ ১২ ॥ ১৪৩ ॥ প. ক. ত

(ই) স্বপ্নে দর্শন। তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানা জানি ॥ ধ্রু ॥
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামল বরণ এক পুরুষ আসিয়া ে-ার
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলু মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই ॥

চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিনী
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায ॥ ১৪॥১৪৫॥ প. ক. ত

স্তুতিপাঠক, দূতী ও সখী ইহাদের মুখ হইতে এবং গীতাদি হইতে যে শ্রবণ হয় এইখানে সেই 'শ্রবণ' বুঝাইতেছে।

পূর্ব্বরাগস্বরূপ রতি বিষযে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব সকল উদয হয। ঐ রতি (ক) প্রৌঢ় (খ) সমঞ্জস ও (গ) সাধারণ এই তিন ভাগে ভাগ করা যায।

প্রৌঢ় রতি—সমর্থ রতি স্বরূপকে প্রৌঢ় রতি বলে। এই প্রৌঢ় রতিতে (১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগর্য্যা, (৪) তানব, (৫) জড়তা, (৬) ব্যগ্রতা, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ ও (১০) মৃত্যু এই দশ দশা হয়।

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা স্তানবং জড়িমাত্রতু।
বৈযগ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদ মোহো মৃত্যুর্দ্দশাদশ।
(উ. নী. ৯ শ্লোক ১৫শ অধ্যায়)

(১) লালসা—অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয় তাহাকে লালসা বলে। লালসায় ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা (নিরন্তর পরিভ্রমণ), ও নিশ্বাসাদি বিকার হয। যথা

মন্দির মাঝে বৈঠল বর-সুন্দরী
দিনকর দুপরঠানে।
যব হাম পুছলু পিরিতি সম্ভাষণ
প্রেমজলে ভরল নয়ানে ॥
মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানযে গুরুজন-বাধা ॥ ধ্রু ॥

ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি ॥
কুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমুঝহ
কোন করব চিতে আনে ॥২৫॥১৫৬॥ প. ক. ত

উদ্বেগ—মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ, উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস, ত্যাগ, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা এবং ঘাম প্রভৃতি হইযা থাকে।

(৩) জাগর্য্যা—নিদ্রানাশের নাম জাগরণ, স্তম্ভ, শোষ, ব্যাধি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

(৪) তানব—অঙ্গের কৃশতাকে তানব বলে, দুর্বলতা ও ভ্রমণাদি ইহার লক্ষণ।

(৫) জড়িমা—যাহাতে ইষ্ট এবং অনিষ্ট জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং যে ভাবের উদয় হইলে প্রশ্ন করিলেও মৌন থাকে এবং দর্শন ও শ্রবণ শক্তি লোপ পায় তাহাকে জড়িমা বলে। হঠাৎ হুঙ্কার দেওযা, স্তম্ভ, দীর্ঘশ্বাস, ভ্রম প্রভৃতি জড়িমার লক্ষণ।

ইষ্টানিষ্টপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেম্বনুত্তরং।
দর্শন শ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে ॥
উ. নী. ১৫শ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক।

যথা, আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজ-রাজ পেখলুঁ
নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে কছু নাহি জানত
নয়নহি অবিরত লোর ॥
সজনি হেরইতে লাগযে ধন্দ।
ঐছন প্রেম কথিলুঁ নাহি হেরিয়ে
নিরুপম নব রস-কন্দ ॥ ধ্রু ॥
শত শত ভকত উচ্চ করি বোলত
কছুই না শুনত বাত।

হুঙ্কৃতি শবদ করত পুন পুন
প্রেমবতি নারিক জাত ॥
হরি হরি শবদ কাণহি যব পৈঠত
তবহি ডারত ঘন শ্বাস।
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে
কহ রাধামোহন দাস ॥ ৩৩ ॥ ১৬৪ ॥ প. ক. ত

(৬) বৈয়গ্র্য—ভাবের গভীরতার জন্য যে বিক্ষোভ হয় তাহার অসহিষ্ণুতাকে বৈযগ্র বা ব্যাগ্রতা বলে। বিবেচনাশূন্য হওয়া, খেদ করা, অসূয়া প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। যথা—

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান।
সো অব বিষশর ধনিমন মান ॥
মাধব তুযা খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার ॥
তুযা বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আনজন যাহা লাগি করে পরকার ॥
মন অবধারি কহ সুসম্বাদ।
ভণে রাধামোহন যাউক বিষাদ ॥৩৭॥১৬৮॥ প. ক. ত

(৭) ব্যাধি—ইষ্ট লাভের অভাবে শরীর পাণ্ডু এবং গ্লানিজনক হইলে তাহাকে ব্যাধি বলে। এই অবস্থায শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস এবং পতনাদি প্রভৃতি হয়।

(৮) উন্মাদ—সকল অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণগত মন এবং সেইজন্য সে এ বস্তু নয় বলিয়া যে ভ্রম তাহাকে উন্মাদ বলে। এই অবস্থায় ইষ্টের প্রতি দ্বেষ, ঘন ঘন নিশ্বাস এবং বিরহ অবস্থায় যে উন্মাদনা তাহা প্রকাশ পায়।

সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিং স্তদতি ভ্রান্তি উন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতং ॥ উ.নী.১৫শ অধ্যায় ১৯ শ্লোক

যথা—

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয় ॥
খেনে আকুল খেনে থার।
খেনে ধাবই খেনে গীর ॥

খেনে খেনে হরি হরি বোল।
সহচারি ধরি করু কোর॥
ঐছন হেরি আগয়ান।
সবহুঁ দগধ করু প্রাণ॥
গুরুজন ভয়ে সখি মেল।
মন্দির মাঝাহিঁ নেল॥
তাহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায়॥৪৪॥১৭৫॥ প. ক. ত

(৯) মোহ—যাহাতে চিত্তের বিপরীত গতি হয় তাহাকে মোহ বলে, এই অবস্থায় নিশ্চলতা ও পতনাদি উৎপন্ন হয়।

মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তা নৈশ্চল্য পতনাদিকৃৎ।

উ. নী. ১৫শ অধ্যায় ১৯ শ্লোক

(১০) মৃত্যু—দূতী প্রেরণ করিয়া এবং স্বীয় প্রেমপীড়া জানান সত্ত্বেও যদি প্রিয়তমের সমাগম না হয় তবে কন্দর্পের বাণের আঘাতে মরণের উদ্যম ঘটে। স্বীয় প্রিয় সখীকে নিজের প্রিয় বস্তুসকল সমর্পণ এবং ভ্রমর, মন্দ পবন, জ্যোৎস্না ও কদম্বাদির সন্ধান প্রভৃতি—এই অবস্থার লক্ষণ।

তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতিকারৈ যদি নস্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণ কদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥
তত্র স্বপ্রিয়বস্তূনাং বয়স্যাসু সমর্পণং।
ভৃঙ্গ মন্দানিল জ্যোৎস্না কদম্বানুভবাদয়ঃ॥

উ. নী. ১৫শ অধ্যায় ২২ শ্লোক

লুঠই ধরণি ধরি সোয়।
শ্বাস বিহিন হেরি সহচরি রোয়॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই।
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহ পূজে জোতিখ আনি॥

কেহ নাশা ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহ বিঘন কেহ লখই ন পারি ॥
শেষ-দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হই পরিণাম ॥৪৯॥১৮০॥ প. ক. ত

সমঞ্জস রতি—যাহা সমঞ্জসা রতির স্বরূপ তাহাকে সমঞ্জস রতি বলে। সমঞ্জস রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে উদয় হইযা বিভাবাদির মিলনে পূর্ব্বরাগের রস সঞ্চার করে। এই সমঞ্জস রতিতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও স্মৃতি ক্রমশ প্রকাশ পায়।

ভবেৎ সমঞ্জস রতি স্বরূপোঽযং সমঞ্জসঃ।
অত্রাভিলাষচিন্তাস্মৃতিগুণসংকীর্ত্তনোদ্বেগাঃ ॥
সবিলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা মৃতিশ্চ তাঃ ক্রমশঃ।
। উ. নী. ১৫শ অধ্যায়, ২২ শ্লোক

এই সমঞ্জস রতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেযসীদের তাহা পূর্ব্বেই বলা হইযাছে।

অভিলাষ—প্রিযতমের সঙ্গ লাভের জন্য যে লালসা তাহা অভিলাষ। অলঙ্কারাদির বাহুল্য ও রাগাদির প্রকাশ দ্বারা লক্ষণ বোঝা যায।

চিন্তা—প্রিযতমের সঙ্গ লাভের উপায সকলের যে ধ্যান তাহাকে চিন্তা বলে। বার বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, ঘন ঘন নিশ্বাস এবং অনর্থক দৃষ্টিপাত প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

স্মৃতি ও গুণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাখ্যা দরকার করে না। উন্মাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যা ও লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেইজন্য এইখানে আর বলা হইল না।

সাধারণ রতি—সাধারণ প্রায রতিকে সাধারণ রতি বলে। সাধারণ রতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইযাছে। উপরোক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে অভিলাষ হইতে বিলাপ পর্য্যন্ত ইহার প্রকাশ।

(খ) **প্রেমবৈচিত্ত**—প্রিযতমের সহিত মিলিত হইযাও যখন গভীর ও ঐকান্তিক প্রেমের জন্য তাহার সহিত বিচ্ছেদের ভয়ে মনে কাতরতার উদয় হয় তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত বলা হয়। যথা

প্রিযস্য সন্নিকর্ষেপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষ ধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্তমুচ্যতে ॥
উ. নী. ১৫শ অধ্যায়, ৫৭ শ্লোক

যথা, শ্যামক কোরে যতনে ধনি শূতল
মদন-আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
জনু কাঞ্চণ মনি জোড়॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদযক তাপ তবহিঁ মঝু মীটব
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ মাধুরি বঙ্ক নেহারই
সোঙরি সোঙরি মনঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥
এত কহি সুন্দরি দীঘ নিশাসই
মুরছিত হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ২ ॥৭৬৫ প. ক. ত

(গ) **প্রবাস**—নায়ক ও নায়িকার মিলন হইবার পর নায়ক যদি স্থানান্তরে চলিয়া যান তবে এই যে বিযোগ তাহাকে প্রবাস বলা হয়। নায়কের প্রবাস অবস্থায় হর্ষ, গর্ব্ব, মত্ততা ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া শৃঙ্গার রস যোগে যে সকল ব্যভিচারী ভাব তাহা আমরা এখানে আলোচনা করিব। প্রবাস দুই প্রকার—বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক। কার্য্যানুরোধে যে প্রবাস তাহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বলে। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস তিন প্রকার (১) ভাবী, (২) ভবন ও (৩) ভূত।

(১) **ভাবী প্রবাস**—যথা

মাধব বিধু-বদনা।
কবহুঁ ন জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ যাব শুনি ভই খীণা।
প্রেম-পরিতাপে চেতন হরু দীনা॥
বিদ্যাপতি ॥২০॥১৬১৭॥ প. ক. ত

ভবন প্রবাস—(২) ভবন প্রবাস—(অক্রুর যখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে রথে করিয়া লইয়া যাইতেছেন তখন শ্রীমতির উক্তি)

কোথা যাহ পরাণ রাধার।
মুখ তুলি চাহ একবার ॥
কি কহিলা কুঞ্জ-কুটীরে।
দুটি হাত দিয়া মোর শিরে ॥
দাঁড়াইতে নাহি গাছতলা।
সায়রে ভাসাইলা ব্রজবালা ॥
তোহারি সোহাগে মজি গেলুঁ।
গুরু গরবিত না মানিলুঁ ॥
উভ হাতে শঙ্কর বোলে।
রথ রাখ যমুনার কূলে ॥৯॥১৬২৮ প. ক. ত

ভূত প্রবাস—(৩) ভূত প্রবাস—যথা (শ্রীমতির উক্তি)

হরি গেও মধুপুরে হাম কুল-বালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতি মালা ॥
কি কহসি কি পুছছি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাম।
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥

৮।১৬৪১ প. ক. ত

অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস—যে প্রবাস পরাধীনত্ব হইতে জন্মায় তাহাকে অবুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবাস বলে।

প্রিয়তমের 'প্রবাস' হইলে যে বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিয়োগ হয় তাহাতে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং মৃত্যুর উপক্রম এই দশ দশা ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বেই এই দশ দশার আলোচনা করিয়াছি। শ্রীমতির এই সকল দশা বর্ণনা করিয়া একটি মহাজন পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বিরহে ব্যাকুল ধ্বনি কিছুই না জানে।
আন আন বরণ হইল দিনে দিনে ॥
কম্প পুলক স্বেদ নয়নহি ধারা।
প্রণয় জড়িমা বহু ভাব বিথারা ॥
যোগিনী যৈছন ধ্যানি-আকার।
ডাকিলে সমতি না দেই দশবার ॥
উনমতি ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে।
জড়িমা ভরল হাত পদ নাহি চলে ॥
আধ আধ বচন কহিছে কার সনে।
পুন পুন পুছয়ে সব তরুগণে ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া ক্ষেণে বাজায মুরলী
দেখিয়া কান্দয়ে সখী করিয়া বিকুলি ॥
মথুরা মথুরা বলি উঠযে কাঁপিয়া।
ললিতার গলা ধরি পড়ে মুরছিয়া ॥
হেন মতে কি বিরহিনী ভাবে বিভোর।
কি কহব রসময় না পাওল ওর ॥ ১৩ ॥ ১৮৬৪ প. ক. ত

এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত লীলা বিশেষানুসারে ব্রজদেবীগণের বিরহের অবস্থা বর্ণনা করা হইল! কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বৃন্দাবনে সর্ব্বদা রাস প্রভৃতি লীলার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সততই বিহারশীল এবং ব্রজদেবীগণের সহিত তাঁহার কখনও বিরহ হয় নাই। কেবলমাত্র প্রকট লীলায় অক্রূরের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, কিন্তু নিত্য লীলায় তিনি সর্বদা বৃন্দাবনে ব্রজদেবীগণের সহিত লীলারসে মত্ত।

(খ) **মান**—পরস্পর অনুরক্ত নায়ক ও নায়িকা একত্র আছেন কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের বিশেষত নায়িকা, ইচ্ছা সত্বেও যদি নায়কের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন বা সেই ইচ্ছাকে দমন করেন অথবা নায়কের আলিঙ্গন লাভের ইচ্ছা থাকিলেও নায়ককে আলিঙ্গন দানে বাধা দেন বা নিজে আলিঙ্গন না করেন তবে তাহাকে 'মান' বলে। এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ব্ব, অসূয়া, ভাবগোপন, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব হয়।

দাম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেব বীক্ষাদি নিরোধি মান উচ্যতে ॥ উ. নী. ১৫শ অধ্যায় ৩১

যথা (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার সখীর উক্তি)

তোহারি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বুল
ধরলহিঁ রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি ন হেরল
বৈঠলি বিমুখ-বিয়াগে॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরি
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরিত যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥

বিদ্যাপতি॥ ১২।৫০০ প. ক. ত

যেখানে প্রণয় আছে সেইখানেই মান হয়। স্নেহ হইতে প্রণয় জন্মিয়া কোন জায়গায় মানে পরিণত হয় আবার স্নেহ হইতে মান জন্মগ্রহণ করিয়া প্রণয়ে পরিণত হয়।

মান দুই প্রকার (১) সহেতু (২) নির্হেতু।

সহেতু মান—ঈর্ষা হইতেই মান হয়। প্রিয়তমের মুখে বিপক্ষ নায়িকার গুণ প্রশংসা শুনিলে ঈর্ষার ভাব প্রণয় হইতে মানে পরিণত হয়। নায়কের প্রতি প্রণয়ই এই ঈর্ষার কারণ যেহেতু অন্য নায়িকাতে লুব্ধ হইলে প্রিয়তমের প্রণয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। এই যে বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য সহেতু মান অর্থাৎ বিপক্ষের উৎকর্ষ বা প্রিয়তমের উপর বিপক্ষের অধিক প্রভাব, তাহা তিন প্রকার (১) শ্রুত (২) অনুমিত এবং (৩) দৃষ্ট।

(১) শ্রুত—প্রিয়সখী এবং শুক প্রভৃতি পাখীর নিকট শুনিয়া যে মান হয়; যথা—

তরুপর রৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপন স্বরে।
কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত-মুখে মন্দলিত স্বরে
কহে গদ গদ ভাখি॥ উদ্ধব দাস॥১৬।৫৪৪ প. ক. ত

(২) অনুমিত—(ক) প্রিয়তমের শরীরে সম্ভোগের চিহ্ন দেখিয়া, অথবা (খ) প্রিয়তমের উক্তি হইতে অথবা (গ) স্বপ্নদর্শনে যে বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যের অনুমান করা হয়। যথা—

(খ) বাক্য স্খলন ঃ

দেখ রাই কানু সখি সনে
দুহুঁ বসিয়াছে নিরজনে।
রস-পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
খলিত ভেল বচনে॥
কহে তুয়া মুখ বলি যাই
কত চন্দ্রাবলি নিছাই॥
শ্যাম বদনে শুনিতে বচনে
কোপে ভরল রাই॥
কহে কি কহলি কহ ফেরি
উহ নাম শুনি পুন বেরি।
মো সঞে কপট পিরিতি তোহারি
মরম বুঝলুঁ তোরি॥
কহি রাই উঠয়ে রোষাই
ধনি মুখ ফেরি চলি যাই॥

উদ্ধব দাস॥ ২২॥ ৫৭১॥ প. ক. ত

(গ) স্বপ্নে দর্শন :

আপন মন্দিরে শুতিয়া সুন্দরী
দেখই ঘুমের ঘোরে।
কানু আন সঞে রভস করই
করিয়া আপন কোরে॥
আন রমণী বিহরে রজনী
হামারি নাগর-কোর।
দেখিতে দেখিতে পাইয়া চেতন
মান ভরমে ভোর॥

॥ ২৩॥ ৫৭২॥ প. ক. ত

নির্হেতু মান—কারণের অভাব এবং নায়ক ও নায়িকার কারণাভাস হেতু যে প্রণয় জন্মে তাহাই মানে পরিণত হয়। প্রণয়ের যে পরিণাম তাহাই সহেতুক মান বলিয়া ধরা হয় এবং প্রণয়ের যে বিলাসজনিত বৈভব তাহাকে

নির্হেতু মান বলা হয়; কেহ কেহ সহেতু মানকে আদ্য মান এবং নির্হেতু মানকে দ্বিতীয় মান বলেন। আবার অনেকে নির্হেতু মানকে প্রণয় মানও বলিয়া থাকেন। নির্হেতু মান কেন হয় তাহা বলা যায় না, তবে ইহা প্রণয়ের একটি অঙ্গ। সর্পের গতি যেমন কুটিল সেইরূপ প্রেমের গতিও বক্র এবং তাহার স্বরূপ জানা অসম্ভব। সেইজন্য কারণের অভাব অথবা কারণ সত্ত্বে নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের মানের উদয় হয়। এইরূপ মানে অবহিত্থা (ভাবগোপন) প্রভৃতি ব্যাভিচার ভাবের উদয় হয়।

অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মানউদঞ্চতীতি ॥
অবহিত্থাদযোহত্র বিজ্ঞেযা ব্যভিচারিণঃ ॥

উ নী. ১৫ অধ্যায় ৪২ শ্লোক

নির্হেতু মানের উদাহরণ এইরূপ—

(ক) কারণাভাস মান :

রসবতি যাই রসিকবর ঠাম।
শ্যাম-তনু মুকুরে হেরই অনুপাম ॥
নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি।
রোখি কহত ধনি আনন ফেরি ॥
নাগর এত কিযে চঞ্চল ভেলি।
হামার সমুখে করু আন সনে কেলি ॥
এত কহি রাই করল তাই মান।
আনঠামে চললি উপেখিযা কান ॥
সহচরিগণ তব কতযে বুঝায।
উদ্ধব দাস মিনতি করু গায ॥ ২॥৫৮৭ প. ক. ত

(খ) অকারণ মান :

দেখ রাধা-মাধব-রঙ্গ
তনু তনু দুহুঁজন নিবিড় আলিঙ্গন
আরতি রভস তরঙ্গ।
কিয়ে অনুভাব কলহ দুহেঁ উপজল
সুন্দরি মানিনি ভেল।
ঐছন প্রেম আরতি বিছুরাইয়া
কো বিহি ইহ দুখ দেল ॥

যদুনাথ ॥ ৬ ॥ ৬০৪ প. ক. ত

নির্হেতু মান উপশম হইতে কোন প্রকার চেষ্টার দরকার হয় না। তাহা যেমন বিনা কারণে এবং কারণাভাসে জন্মায় তেমনই আবার স্বতই উপশমিত হয়। কিন্তু সহেতু মানের (ক) সাম (খ) ভেদক্রিয়া (গ) দান (ঘ) নতি (ঙ) উপেক্ষণ ও (চ) রসান্তর দ্বারা উপশম হয়।

(ক) সাম—মানিনী নায়িকার প্রতি নায়ক প্রিয় বাক্য বলিয়া মান উপশম করিতে চেষ্টা করেন তবে তাহাকে সাম বলে ; যথা—

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি— চাঁদ বদনি তুহু রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।
দুরে গেল বিহি-বরণীতে॥
অনুগত কিঙ্কর দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝাসি রোখে॥
যবহু উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দ দাস মরি যাব॥ ২৪॥৫৮॥ প. ক. ত

(খ) ভেদ—ভঙ্গি দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া নায়ক যদি মানিনীর মান উপশম করার চেষ্টা করেন তবে তাহা এক প্রকার 'ভেদ', এবং নায়ক যদি মানিনীর সখি দ্বারা মানিনীকে মান করার জন্য ভৎর্সনা করিয়া মান উপশম করার চেষ্টা করেন তবে তাহা অন্য প্রকার 'ভেদ'।

(গ) দান—ছল পূর্ব্বক নায়ক মানিনীকে যদি অলঙ্কারাদি দেন তবে তাহাকে দান বলে।

(ঘ) নতি—নায়ক দৈন্য অবলম্বন করিয়া নায়িকার পদতলে পড়িয়া মান ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে নতি বলে।

(ঙ) উপেক্ষণ—উপরোক্ত সাম প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া যদি মানিনীর মান উপশম না হয়, তবে নায়িকার প্রতি নায়কের যে অবজ্ঞা হয় তাহাকে কেহ কেহ উপেক্ষা বলেন ; মানিনীর মানের উপশম করিতে না পারিয়া যদি নায়ক মৌন হইয়া রহেন তবে কেহ কেহ তাহাকেও উপেক্ষা বলেন ; নায়ক যদি

মানিনীর প্রতি মুখ্য ভাবে তাহার স্তুতি না করিয়া অন্য অর্থ হয় এইরূপ বাক্যের দ্বারা মানিনীকে প্রসন্ন করেন তবে তাহাকেও কেহ কেহ উপেক্ষা বলেন।

(চ) রসান্তর—আকস্মিক ভয় প্রভৃতি হইলে রসান্তর হয়। রসান্তর দুই প্রকার (অ) যাদৃচ্ছিক এবং (আ) বুদ্ধি পূর্ব্বক।

আকস্মিক ভয়াদিনাং প্রস্তুতিঃ স্যাদ্রসান্তরং।
যাদৃচ্ছিক বুদ্ধি পূর্ব্বমিতি দ্বেধা তদুচ্যতে॥
উ. নী. ১৫শ অধ্যায়, ৫১ শ্লোক

(অ) যাদৃচ্ছিক—যাহা হঠাৎ উপস্থিত হয় তাহার নাম যাদৃচ্ছিক, এবং তাহাতে ভয় পাইয়া মানিনীর মান উপশম হয়। যথা—

পদ্মার মান দেখি হরি অনেক বিনয় করি
বহু যত্নে নারিল খণ্ডিতে।
সখীর বিনয় বাতে উত্তর না দিল তাথে
মৌন করি রহিল মানেতে॥
হেন কালে দৈব দোষে অরিষ্ট অসুর এসে
বজ্র তুল্য শব্দ করিল।
তাথে মান ছাড়িয়া ভয়েতে কম্পিত হিয়া
আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণেরে ধরিল॥ উ. চ.

(আ) বুদ্ধি পূর্ব্বক—প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা নায়ক যদি মানিনীর মান উপশম করেন তবে তাহাকে বুদ্ধি পূর্ব্বক রসান্তর বলে।

কতরূপে মিনতি করল বর-নাহ
গলে পীতাম্বর ঠাড়হি কর যোড়ি
তব ধনি পালটি ন চাহ॥
তবহুঁ রসিকরাজে সিরজিয়া মন মাঝে
গদ গদ কহে আধবাত।
পাঁচ বদন আহি মঝুপদে দংশল
জর জর ভেল সব গাত॥
এত কহি নাগর কাঁপই থর থর
মুরছি পড়িল সোই ঠাম।
কি ভেল কি ভেল বলি রাই ধাই চলি
কোরে করল ঘনশ্যাম। ১২॥ ৪১৭॥ প. ক. ত

মানোপশম—উপরোক্ত সাম প্রভৃতি ব্যতীত ও ব্রজসুন্দরীগণের নির্হেতুমান দেশ ও কালের প্রভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া উপশম হয়।

সম্ভোগ—প্রিয়তমের দর্শন ও আলিঙ্গন প্রভৃতির জন্য নায়িকাদের যে অবস্থা হয় তাহাই সম্ভোগ। নায়ক ও নায়িকার উভয়ের ভাবের উল্লাস হইলে তাহা সম্ভোগ। সম্ভোগ দুই প্রকার (১) মুখ্য ও (২) গৌণ।

দর্শনালিঙ্গনাদিনামানুকুল্যান্নিষেবয়া।
যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥
মণীষিভি রয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ॥৪॥

উ. নী. ১৬শ অধ্যায়

মুখ্য সম্ভোগ—জাগ্রত অবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকার। এই চারিটি পূর্ব্বরাগ মান, কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর প্রবাস ভেদে (১) সংক্ষিপ্ত (২) সংকীর্ণ (৩) সম্পন্ন ও (৪) সমৃদ্ধিমান হইয়া থাকে। কোন কোন আলংকারিকের মতে প্রেম-বৈচিত্ত্র্যের পর যে সম্ভোগ তাহা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধি মান হইয়া থাকে।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—লজ্জা ও ভয় হেতু যে সম্ভোগে নায়ক ও নায়িকা ভোগাঙ্গ বস্তু অল্পমাত্র ব্যবহার করে তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে।

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বস্ ব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥৬॥

উ. নী. ১৬শ অধ্যায়

যথা—

সুরত-তিষাসে ধয়ল পহুঁ পানি
করে কর বারই তরল-নয়ানী॥
কণ্ঠ পরিরম্ভণে পরশিতে গাত।
নহি নহি বোলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিনী রাই।
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গ অবগাই॥ ধ্রু॥
চুম্বনে সঙ্কুচ লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই সিতকার॥
নখর পরসে ধনি চমকই গোরি।
দশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোড়ি॥
কহইতে কহ গদগদ পদ-আধ।
অনঅনো-মনে মনসিজ-উনমাদ॥

তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ।
গোবিন্দ দাস কহ রস-মরিযাদ ॥২৬॥৫৯॥ প. ক. ত।

সংকীর্ণ-সম্ভোগ—নায়কের আলিঙ্গনাদির সময় স্বীয় বিপক্ষের গুণগান নায়ক করিয়াছেন এবং নায়ক কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া নায়কের আলিঙ্গনাদি যেখানে নায়িকার কাছে সংকীর্ণ হইয়া যায় তাহাকে সংকীর্ণ সম্ভোগ বলে। গরম আখ মুখে দিলে আখের মিষ্টতার সহিত উষ্ণতাও যেমন অনুভূত হয়, সংকীর্ণ সম্ভোগের প্রকৃতি সেইরূপ। পূর্ব্বেই বলিযাছি মানের উপশমে যে সম্ভোগ তাহাই সংকীর্ণ সম্ভোগ।

যত্র সংকীর্য্যমানাঃ স্যুর্ব্যলীক স্মরণাদিভিঃ।
উপাচারাঃ স সংকীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুনেশলঃ ॥১০॥
উ. নী. ১৬শ অধ্যায়।

যথা, দূরে গেল মানিনি মান।
অমিয়া সরোবরে ডুবল কান ॥
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেম ভরে সুবদনি তনু জনুস্তম্ভ ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরি গদগদ দীর্ঘ নিশাস ॥
কোরে আগয়াল নাহ।
করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ ॥
লহু লহু চুম্ব বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান ॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহিঁ মনোভব তব নাহি ভেল ॥
তোড়ল যব-নিবি-বন্ধ ॥
হরি-মুখে তবহি মনোভব মন্দ ॥
তব কচ্ছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ ॥৪০॥২৪॥ প. ক. ত

সম্পন্ন-সম্ভোগ—অদূর প্রবাস হইতে প্রিয়তম ফিরিয়া আসিলে সেই বিপ্রলম্ভের পর যে সম্ভোগ হয় তাহা সম্পন্ন সম্ভোগ নামে পরিচিত, সম্পন্ন সম্ভোগ দুই রকম (অ) আগতি ও (আ) প্রাদুর্ভাব।

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ ॥
দ্বিধাস্যাদ্দাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতিঃ স সঙ্গমঃ ॥ ১৩ ॥
উ. নী. ১৫শ অধ্যায়

(অ) আগতি—লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন হইলে তাহাকে আগতি বলে। গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন, তাহা এই পর্য্যায়ে মিলন।

(আ) প্রাদুর্ভাব—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিহ্বল হইয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ যদি শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রিয়তমার সাক্ষাতে আসেন তবে তাহাকে প্রাদুর্ভাব বলে। রাসলীলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে ব্রজদেবীগণ যখন তাঁহার বিরহে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছেন তখন হঠাৎ তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন, এই আকস্মিক মিলনই প্রাদুর্ভাব।

সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগ—পরাধীন থাকার জন্য নায়ক ও নায়িকার মধ্যে বিরহ হইলে তাহাদের পরস্পর দর্শন দুর্লভ। এরূপ স্থলে মিলনে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ হয় তাহার নাম সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

দুর্ল্লভা লোকযো যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগ্যাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥ ৬ ॥
উ. নী. ১৫শ অধ্যায়।

রাধামাধব চিরদিনে মেলি।
দুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি ॥
দরশনে পুলকিত দুহুঁ তনু কাঁপ।
পুন পুন লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণি।
ঘামে ভিগল তনু ঘনে অছু মানিনি ॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি।
রাধামোহন পহু দুহুঁ রস-কেলি ॥

গৌণ-সম্ভোগ—স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলে তাহাকে গৌণ সম্ভোগ বলা হয়। সামান্য ও বিশেষ ভেদে ঐরূপ স্বপ্ন দুই প্রকার। ‘সামান্য’ স্বপ্ন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করিয়াছি; তাহা ব্যাভিচারীভাবের ভিতর আলোচিত

হইয়াছে। যাহা বিশেষ স্বপ্ন তাহা জাগর্য্যা বিশেষ, ও ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত। এই ভাবোৎকণ্ঠ স্বপ্নবিশেষ পূর্ব্বোক্ত (ক) সংক্ষিপ্ত (খ) সংকীর্ণ (গ) সম্পন্ন ও (ঘ) সমৃদ্ধিমান ভেদে চার প্রকার।

পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্তাদির মধ্যে সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ করা যাইতেছে, ইহারাই স্পষ্ট-সম্ভোগ রতির অনুভব দশাকে প্রাপ্ত হয়। সেই সকল অনুভব দশা যথা (১) দর্শন (২) জল্প (বাদানুবাদ), (৩) স্পর্শন, (৪) বর্ত্মরোধ, (৫) রাস, (৬) বৃন্দাবনক্রীড়া, (৭) যমুনা জলকেলি, (৮) নৌবিলাস, (৯) লীলা দ্বারা চৌর্য্য, (১০) ঘাট (দানঘাট) (১১) কুঞ্জে লুকান, (১২) মধুপান, (১৩) স্ত্রীবেশ ধারণ, (১৪) কপট নিদ্রা, (১৫) পাশক ক্রীড়া, (১৬) বস্ত্রাকর্ষণ, (১৭) চুম্বন, (১৮) আলিঙ্গন (১৯) নখার্পণ, (২০) বিম্বাধর সুধাপান ও (২১) সম্প্রয়োগ প্রভৃতি।

(১) দর্শন।

(২) জল্প—পরস্পরের বাদানুবাদকে জল্প বলে।

(৩) স্পর্শন।

(৪) বর্ত্মরোধ—নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকার পথরোধ করিয়া যে মিলন হয়।

(৫) রাস—অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো

মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।

ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো

বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ ॥১২॥১২৬৪॥ প. ক. ত

প্রত্যেক ব্রজাঙ্গনা-দ্বয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও বহুরূপে প্রকাশমান প্রত্যেক শ্রীকৃষ্ণদ্বয়ের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা—এইরূপে সংগঠিত রাস-মণ্ডলের মধ্যগত হইয়া দেবকীনন্দন বংশীধ্বনি করিলেন।

(৫) বৃন্দাবন ক্রীড়া: চিরদিন মিলন হোয়ল নিধুবনে

নিধুবন কত কত ভাতি।

তৈছন সখিগণ কয়ল গুণ কীর্ত্তন

দুহুঁ কর প্রেমে উনমাতি ॥

হরি হরি কি কহব অদভুত প্রীত।

দুহুঁ কর প্রেম অতুল হেম সম

দুহুঁ জানয়ে দুহুঁ রীত ॥

(৭) যমুনা জলকেলি— সকল-কলা রস সাগর নাগর
নাগরি-মুখ-শশি চাহ।
কেলি-বিলাস ছরম ঘরমাইত
কালিন্দি করু অবগাহ ॥
দেখ সখি ইহা পুন লহ জলকেলি।
শীকর নিকরহি ঘুমল মদন পর
শর বরিখয়ে দুহুঁ মেলি ॥ধ্রু॥
॥২৪৭॥২৭২০॥প. ক. ত

(৮) নৌকাবিলাস —
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই।
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই ॥
রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে।
এপার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে ॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ প্রেমে ভাসে।
নৌকাবিলাস কহে উদ্ধব দাসে ॥১৫॥১৪২৩ প. ক. ত

(৯) লীলাদ্বারা চৌর্য্য— সব সখিগণ মিলি বিনোদিনি রাই।
করসঞে মুরলি যতনে চোরাই ॥
পল-এক জাগি বৈঠল পীতবাস।
জল সেচন করু গোবিন্দ দাস ॥
৩৮ ॥ ২৭৮৪ ॥ প. ক. ত

(১০) ঘট্ট— খেয়াঘাটে পার করা এবং পার করার জন্য মাশুল আদায় করিবার সুযোগ লইয়া যে সম্ভোগ।

গরবহিঁ সুন্দরি চললহ আনত
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহি বাত দান দেহ মঝু হাত
আনছলে কাঁচলি তোড় ॥
অপরূপ প্রেম তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিৎ রঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
রাধামোহন ॥ ৩৮ ॥ ১৩৪০ ॥ প. ক. ত

(১১) কুঞ্জে লুকান

(১২) মধুপান— মধুপানে মত্ত হৈলা রাধা নিতম্বিনী।
মদনস্পৃহাতে করে শযন বাঞ্ছনি।
সেবাপর সখি তারা নানা সেবা করে।
দুহুঁকে লইযা গেল শযনের ঘরে॥
কুসুম-শয্যাতে দুহুঁ কা:লা শযন।
নিজ নিজ কুঞ্জে শুইলেন সখিগণ॥

১৬৮॥ ২৬৩১ ॥ প. ক. ত

(১৩) স্ত্রীবেশ ধারণ— শুনি সখিবচন মনহি অনুমান।
নাগরি-বেশ বনাওল কান॥
আগুপদ বাম বামগতি চাহনি
বাম কুন্তল অনুপামা।
বাম ভুজে বসন ঢুলাযত ঘন ঘন
যৈছন পেঁখলু শ্যামা॥

জ্ঞানদাস ॥ ১১ ॥ ৫৩৬ প. ক. ত

(১৪) কপট নিদ্রা

(১৫) পাশক ক্রীডা— পাশা খেলার ভিতর দিযা যে মিলন।
হাঁতহি হাত লগাই যত খেলত
ভাবে অবশ তব দেহ
আনন্দ-সাগরে নিমগন দুহুঁ মন
ভুলল নিজ নিজ গেহ।

রাধামোহন ॥ ২০০ ॥ ২৬৭৩ প. ক. ত

(১৬) বস্ত্রাকর্ষণ

(১৭) চুম্বন

(১৮) আলিঙ্গন

(১৯) নখার্পণ

(২০) বিম্বাধর সুধাপান

(২১) সম্প্রয়োগ—গোপনে হয় না। পূর্ণ সুখ হয় 'লীলা নিত্যবিলাস।

পরিশিষ্ট (ক)

বহু শত বৎসর ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা কাহিনী লইয়া বাঙলায় এক বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিযাছে। বাঙালী সেই পদাবলী হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছে, প্রেরণা পাইয়াছে, এবং তাহাকে অতিপ্রিয় অনুভূতির সুন্দরতম প্রকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ—ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির গভীরতা ও বিচারের তীক্ষ্ণতা এ যুগে মানুষের মনকে অধিক আকর্ষণ করিযাছে। এ যুগের মানুষ তাই বৈষ্ণবপদাবলীকে ভক্তহৃদয়ের সরলতা ও বিশ্বাস লইযা গ্রহণ করিতে চাহে না। সেইজন্য একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই বাঙলা দেশে পদাবলী-জাতীয় পদরচনা প্রচলিত ছিল এবং চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে এই পদগুলির আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা লাভ ঘটিয়াছে। সেই সঙ্গে এইরূপ মতও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে প্রেমের স্পর্শ পাইযাছিলেন সেই আত্ম-প্রেমের কাহিনাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে রূপকচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে ভাব ও যে ব্যঞ্জনা আছে তাহা বিশুদ্ধ মানবীয় ভাব ও ব্যঞ্জনা। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে ইহার উপর অলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> সত্য করে কহ মোরে, হে বৈষ্ণবকবি
> কোথা তুমি পেযেছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
> বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নযান
> রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?

বৈষ্ণবকবিগণ কিন্তু রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কখনই রূপক মনে করেন নাই। তাঁহাদের নিকটে ইহা পরম সত্য, ইহা লীলামাত্র। রসশেখর শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় বৃন্দাবনে যে প্রেমের লীলার অনুষ্ঠান করিযাছিলেন, বৈষ্ণবপদাবলী সেই লীলার চিত্র। বৈষ্ণবকবিগণের ইহা ভক্ত-মানসের ফল।

বৈষ্ণবপদাবলীর অন্য নাম মহাজন পদাবলী। আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণবপদগুলি গীতিকাব্যধর্ম্মী হইলেও মুখ্যত এই সমস্ত পদ ভক্ত বৈষ্ণবদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভক্তিমানসের প্রকাশ। বৈষ্ণব-চরিত-আখ্যানগুলি যেমন

কেবলমাত্র জীবনী নহে, লেখকের ভক্তপ্রাণে লীলার যে মাধুর্য্যের আস্বাদন হইয়াছে তাহারই প্রকাশ, সেইরূপ মহাজন পদ কেবলমাত্র কবিকল্পনার ফল নয়, তাহা ভক্তহৃদয়ের লীলা মাধুর্য্যের আস্বাদন। অর্থাৎ পদকর্ত্তাগণ যে সমস্ত পদ রচনা করিযাছেন তাহা কেবলমাত্র কাব্য-চর্চ্চা নহে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যে নিত্যলীলা চলিতেছে, সেই লীলার আস্বাদন করাই তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ এবং মহাজন-পদাবলী সেই সাধনার উপলব্ধ রসসঞ্জীবনধারা। এই সমস্ত পদ তাঁহাদের গভীর অনুভূতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের ফল। অবশ্য গীতিকাব্যও কবির গভীর অনুভূতির ফল, কিন্তু ভাষায়, রসে ও ভঙ্গিতে গীতিকবিতার সমগোত্র হইলেও বৈষ্ণবপদগুলিকে গীতিকবিতা হইতে পৃথক ভাবে গণ্য না করিলে ইহাদের সম্যক তাৎপর্য্য বোঝা যাইবে না।

বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশ করা হইত কীর্ত্তন নামে এক প্রকার বিশেষ গানের ঢঙে। কিন্তু যতই গীতধর্ম্মী হউক না কেন গান কখনই কবিতা হইতে পারে না। কারণ কবিতার প্রধান অবলম্বন কথা এবং গানের প্রধান অবলম্বন সুর। বৈষ্ণবপদ কীর্ত্তনের রীতিতে গীত হইলে তাহার মাধুর্য্য যেরূপ আস্বাদন করা যায় শুধু পড়িলে তাহার মাধুর্য্য সেইরূপ আস্বাদন করা যায না। ভাবমাধুর্য্য যেরূপ পদাবলীর প্রাণ সেইরূপ গীতিকবিতারও প্রাণ, কিন্তু কীর্ত্তনের ভঙ্গিতে গীত হইলেই পদাবলীর সেই ভাব মাধুর্য্যের সম্যক আস্বাদন করা যায়। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে ভাষায উচ্চ স্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম লীলা ও গুণ গান করা—নামলীলাগুণাদিনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্—শ্রীরূপগোস্বামী কীর্ত্তনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শুধু গান করাকে কীর্ত্তন বলিলেও ভুল হইবে। কারণ নবধা-ভক্তিলক্ষণ-বর্ণনায কীর্ত্তনের উল্লেখ আছে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তির জন্য তাঁহার গুণ-কথন এবং লীলাবর্ণনের প্রয়োজন এবং তাহা হইতেই এই প্রকার গানের নাম হইযাছে কীর্ত্তন। কীর্ত্তন বলিতে আমরা বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতপদ্ধতি বুঝি এবং সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে কীর্ত্তন সঙ্গীত একমাত্র বাংলাদেশেরই নিজস্ব। কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশের সাধক তুকারাম যে ভগবৎ সম্বন্ধে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহাও কীর্ত্তন নামে পরিচিত। কীর্ত্তন দুই রকম—নাম-কীর্ত্তন ও লীলা-কীর্ত্তন।

কবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যে বলিয়াছেন—

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো।
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্ত পদাবলীং
তদা শৃণু জয়দেব সরস্বতীং। (১ম সর্গ।৩।)

জয়দেবের পর হইতেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকাশ করিয়া যে সমস্ত গীত রচনা হইয়াছে, তাহাই 'পদ' নামে পরিচিত এবং চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের সাধকগণের রচনায় ইহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

মহাজন-পদ কেবলমাত্র শুষ্ক তত্ত্ব বা দার্শনিক বিচার বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। বৈষ্ণব-সাধকগণ রূপ ও রসের সাহায্যে নিজেদের ভক্ত-হৃদয়ের অনুভূতি এই পদগুলিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পদগুলির সরলতা ও তন্ময়তা আমাদের মুগ্ধ করে। বৈষ্ণব-সাধকগণ ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বলিতে চাহেন যে কেবলমাত্র মানুষের ভাব দিয়াই ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায়। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নররূপ তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর।
নরলীলার হয় অনুরূপ। (চৈ. চ. মধ্য)

নররূপ শ্রীকৃষ্ণের এই নরলীলার যে আস্বাদন তাহা ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে এই সকল পদে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য এই সকল পদ কেবলমাত্র সাধককেই আকর্ষণ করে না, সাধারণ লোকও ইহাতে আকৃষ্ট হয়। মহাজনদের মতে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ দূরের নহেন, তিনি অন্তরের। তাঁহার রূপ, রস ও মাধুর্য্যের তুলনা নাই। তাই মানবীয় ভাব ও ভাষায় এই সকল পদ উদ্ভাসিত হইলেও মহাজনদের প্রেরণা হইতেছে অতিমানবীয়। তাঁহারা যে প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রাকৃত প্রেম নয়, তাহা অপ্রাকৃত এবং তাহা মধুর বা উজ্জ্বল রস। সেইজন্য সাধারণ প্রাকৃত প্রেমের দ্বারা এই সকল পদগুলির ব্যাখ্যা করিতে গেলে ইহাদের মর্মস্থলে পৌঁছান যাইবে না। এই পদগুলিতে যে প্রেমের সুর তাহা সাধারণ কবির প্রেমগীতি নহে, তাহা ভক্তের সাধনার অনুভূতি এবং তাহা ইন্দ্রিয়াতীত। কেবলমাত্র নাম শুনিয়া যে তন্ময়তা তাহার দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে বিরল নয়। কিন্তু মহাজন পদাবলার নায়িকার রাধা নাম শুনিয়া শুধু তন্ময় হইয়া পড়েন না, ভক্ত সাধকের ন্যায়

তিনি সেই নাম জপিতে আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধা তাই ধ্যান-পরায়ণা যোগিনী—

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনীপারা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন-তারা॥

রাধার এই প্রেমোন্মাদনা বৈষ্ণব কবিগণের কবিমানসের ফল নহে। মহাপ্রভুর যে প্রেমোন্মাদনা তাঁহারা নিজেরা দেখিয়াছেন বা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হইতে শুনিয়াছেন, রাধার বিরহের উন্মাদনা তাহারই প্রতিচ্ছবি। মহাপ্রভুর ভক্ত-চিত্তের এই দিব্যোন্মাদ পদাবলীর রাধায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পদাবলীতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কথা থাকিলেও মধুর ভাবই প্রধান এবং এই মধুর ভাব বা প্রেমকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বৈষ্ণবেতর সাহিত্যেও 'মান' বা 'প্রবাসের' কথা আছে; কিন্তু পূর্ব্বরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য বৈষ্ণবরস-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে মিলনের আনন্দ অপেক্ষা বিরহের বেদনাই যেন বিশেষ করিয়া দেখা যায়; পূর্ব্বরাগে বিরহ, মানে বিরহ, প্রবাসে বিরহ—বিরহের গভীর বেদনায় মহাজন পদাবলী গভীরভাবে ওতপ্রোত। তাই পরিপূর্ণ মিলনের পরিবেশের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই "দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

পদাবলীর কবিগণ মানবীয় পরিবেশের ভিতর দিয়া অখিলরসামৃত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজের মনের কোন পরিচয় সেই প্রেমোচ্ছ্বাসে পাওয়া যায় না। পদগুলিকে আমরা ভক্তহৃদয়ের ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ গণ্য করিতে পারি। আধুনিক কবিগণের গীতিকবিতা বা লিরিক হইতে আমরা কবিমানসের পরিচয় পাই, তাঁহাদের প্রেমের গভীরতা ও আকুতি তাহাতে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যের শাশ্বত রূপাস্বাদনের পিপাসা তাহাতে পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে কেবলই ভাবাবেগ; সে ভাবাবেগ অতি সচেতন বুদ্ধি বা চিন্তার দ্বারা পরিমার্জ্জিত নহে—তাঁহাদের সঙ্গীতে তাঁহাদের হৃদয়াবেগের স্বাভাবিক স্ফুরণ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক লিরিক-কবিগণ প্রত্যক্ষ ভাবে আপনাদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিলেও গভীর আত্মসচেতন চিন্তার

দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জিত হওয়ায় তাহার আবেগ সহজে আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সেইজন্য আধুনিক লিরিক কবিতা সেইরূপ প্রাণস্পর্শী হয় না। তাহাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ থাকিয়া যায়। বৈষ্ণব কবিগণ বাস্তবতার পরিবেশে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক লিরিক কবিরা মানসী প্রিয়ার মনোরঞ্জনে তৎপর থাকায কবিকে হৃদযাবেগ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর পায়ে অলঙ্কারের শৃঙ্খল জড়ান। কিন্তু আধুনিক লিরিক কবিগণ অলঙ্কারের এই শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতার পটভূমি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। আধুনিক লিরিক কবিগণের কবিতার পটভূমি অনেক বিস্তৃত এবং তাহাদের কাব্যের বিষয়বস্তুও অনেক বেশী। বৈষ্ণব কবিগণ সংশ্লেষণ (Synthetical) প্রণালীতে ভাব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু আধুনিক লিরিক কবিরা বিশ্লেষণ (Analytical) প্রণালীতে তাঁহাদের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবিরা প্রস্তুতির ফলকে তাঁহাদের মনোভাবনিচয় অঙ্কিত করিতেন কিন্তু আধুনিক কবিগণ তাহা করেন না। মহাজন পদাবলীতে একটা সতেজ ও সরল ভাব পাওযা যায়, যাহা আধুনিক লিরিক কবিতায় পাওয়া যায় না।

বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম একদিন এদেশের সাহিত্যকে তন্ময করিয়া রাখিয়াছিল। বহু শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আজ সেই ভাবমুগ্ধ বৈষ্ণবীয় প্রেমের রেশ বাঙলা সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের বজ্রনির্ঘোষে সুপ্ত বাঙালীকে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজের মধুর ভাবাবেশ তাঁহাকেও বিহ্বল করিতে ছাড়ে নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই বৈষ্ণব-প্রভাব এক অভিনব রূপে দেখা দিল। কবি প্রথম যুগে বৈষ্ণব কবিতার অনুসরণে ভানুসিংহের পদাবলী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনুসরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহিরঙ্গ মাত্র। ঔপনিষদিক দর্শনের সহিত বৈষ্ণবের নিত্য-লীলাকে মিশ্রিত করিয়া রবীন্দ্রদর্শন এক অপরূপ আত্ম-তন্ময়তা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাই ব্রজধামের নিত্যলীলার নূপুর-ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমবাদ তাই বৃন্দাবনের প্রেমলীলার ভিতর অবসান লাভ করিয়াছে,

আজি সেই প্রেম অবসান লভিযাছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।

নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিলেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

বৈষ্ণব দর্শনের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত কাব্যাংশটিতে—

প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

পরিশিষ্ট (খ)

বহুপ্রকার মতবাদের সংশ্লেষণে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে; ভারতবর্ষে সেইজন্য দেখিতে পাই বহু প্রকার ভেদবাদ এবং বহু বিরুদ্ধ মতবাদের একত্র সম্মিলন। কোন সংস্কৃতিকে সমূলে উচ্ছেদ না করিয়া তাহাকে আত্মস্থ করাই ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব। দ্রাবিড়গণ যে সভ্যতা এদেশে পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বিনাশ করেন নাই; আবার আর্য্যগণও যে সভ্যতার সহিত এখানে পরিচিত হইলেন তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলেন নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি যুগে যুগে নূতন সংস্কৃতিগত সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্য ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিয়াছে। দ্রাবিড়, শক, গ্রীক, মোঙ্গল প্রভৃতি বহু সভ্যতাই একত্রে গ্রথিত হইয়া বিরাট সর্বভারতীয় সংস্কৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছে। (১)

বহু জাতি-উপজাতির বিচিত্র সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করিয়া যে হিন্দু সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার চরম বিকাশ আমরা গুপ্ত যুগের সভ্যতায় দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ্যবাদ সুসংহত হইয়া গেল এবং ত্রিমূর্ত্তির উদ্ভব হইল। (২) কিন্তু সে সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে প্রাণের স্পন্দন চলিয়া গেল, তাহার যে গতিশীলতা ছিল তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় পূর্ব্বের সমন্বয় স্পৃহার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ঐতিহ্যও লোপ পাইল। গুপ্ত সম্রাটগণ যে "একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের" স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—হর্ষবর্দ্ধনের যুগে সে স্বপ্নের বিস্তৃতি কমিয়া গেল। সেইজন্ত হর্ষবর্দ্ধনের মুদ্রায় তাঁহাকে কেবলমাত্র সকল "উত্তরাপথনাথ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সংস্কৃতির পথ-প্রদর্শকরূপে উত্তর-ভারতের গৌরব নষ্ট হইয়া গেল এবং নূতন যুগের পথ প্রদর্শক হিসাবে দক্ষিণ-ভারত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। ইহার পিছনে ঐতিহাসিক কারণ ছিল। হজরত মহম্মদ মানুষকে যে নূতন বাণী শুনাইলেন, মানুষ তাহাতে নূতন প্রেরণা লাভ করিল। ইসলামের আদর্শ ও ইসলামের বাণী সমুদ্রপথে দক্ষিণ-ভারতেই প্রথম প্রবেশ করে। ইসলাম ধর্ম্মের সংঘাতে দক্ষিণ-ভারত নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্ম সমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। এ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতই এই দুই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। ক্রমে ভক্তিপ্রধান একেশ্বরবাদ, বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্ম দ্রাবিড় দেশেই উদ্ভব হইল। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য এবং নিম্বার্কাচার্য্য সকলেই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। ইসলামের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন (৩)।

রামানুজ-দর্শনে মানুষ ও দেবতার মধ্যে প্রেম স্থাপিত হয় এবং সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য দেবতা ও ধর্ম্মের বাণীও শোনা যায়। ডঃ তারাচাঁদ মনে করেন যে, দেবতার সহিত মানুষের কি সম্বন্ধ তাহা বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত নাজ্‌জাম আম্‌আবী গিজনি প্রমুখ মুসলমানগণের ঐ সম্বন্ধে যে বিতর্ক তাহার তুলনা করা চলে এবং মনে হয় ঐ সব বিতর্কের দ্বারা বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন (৪)।

শ্রীবিনয় ঘোষ মনে করেন যে, ইস্‌লামের অভিযানের বিরুদ্ধে শঙ্করের মতবাদ ইস্পাতের ন্যায় কঠোর। সেই জন্য শঙ্কর শুদ্ধ জ্ঞানবাদী এবং তাঁহার মতবাদ সেইজন্য কেবলাদ্বৈতবাদ, কিন্তু রামানুজ ও নিম্বার্কের সময় ইসলামের প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহাদের মতবাদ কঠোর জ্ঞানবাদের সহিত ভক্তিরস মিশিয়া সরস হইয়া উঠিয়াছে (৫)।

মুসলমান সাধকদের, বিশেষ করিয়া সুফী সম্প্রদায়ের সাধকদের প্রেমের সাধনা পরবর্ত্তী ভারতীয় সংস্কৃতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে

তাহার সম্যক আলোচনা এখন পর্য্যন্তও হয় নাই। কিন্তু ভারতীয় বুনিয়াদী সংস্কৃতির সহিত সংঘাত হওয়ায় তাহার সাহত সমন্বয় করিয়া যে নূতন ভাবধারার উদ্ভব হইল তাহাকে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলেও তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলাদেশ মানবপন্থী, শাস্ত্রপন্থী নয়। বাংলাদেশ দেবভূমি নয় ; বাংলাদেশ রক্ত মাংসে গড়া মানুষের দেশ। বাঙালী দেবতাকে শ্রেয় বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখে না, প্রেয় বলিয়া কাছে টানিয়া লয়। পরমশক্তিকে বাঙ্গালী "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা" বলিয়া শুধু ধ্যান করে নাই ; তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার কাছে ছেলের মত আব্দার করিয়াছে, আবার তাঁহাকেই কন্যা কল্পনা করিয়া আদর করিয়াছে। যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব বাঙ্গালীর ঘরে আদরের জামাই। সর্ব্বসিদ্ধি গণপতি সেখানে আদরের নাতি। শিবায়নে শিবের যে চিত্র তাহা বাঙালীর ঘরের চিত্র। কৃত্তিবাসের রাম ভগবানের অবতার নহেন, তিনি একজন আদর্শ বাঙালী। বৃন্দাবনের রাধামনোচোরকে কোন শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওযা যাইবে না— তাঁহাকে শুধু পাওয়া যাইবে বাঙালীর অন্তরে। বাংলাদেশে যে মিলন তাহা শুধু বুদ্ধির মিলন নয়, বাংলার সমন্বয় শুধু আদর্শের সমন্বয় নয়, বাংলার সমন্বয় আবেগের সমন্বয়। বাংলার মহাযান, সহজযান, বজ্রযান, শৈবমত, তন্ত্রমত সমস্তই এই আবেগের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম তাই কোন বিধি-নিষেধ মানে নাই—বাংলার বৈষ্ণব কবি সেই জন্যই গাহিয়াছেন—

দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

যুগাবতার চৈতন্যদেব বুঝিযাছিলেন শাস্ত্রের বাঁধা পথে বাঙালীকে তথা বাঙলার জনগণকে আকৃষ্ট করা যাইবে না, কারণ বাঙালী কখনই শাস্ত্রের চোখ রাঙ্গানিকে ভয় করে নাই। বাঙালী একমাত্র যে পথটি পছন্দ করে তাহা উদার প্রেমের পথ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ ও শাস্ত্রের অত্যাচারে জর্জ্জরিত বাংলা দেশে যে বিক্ষোভ চলিতেছিল, তাহাকে শান্ত করিতে হইলে দরকার সাম্য ও ঐক্য। চৈতন্যদেব ইহা বিশেষরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। জগাই ও মাধাই তৎকালীন বিকৃত হিন্দু সমাজের প্রতীক এবং তাঁহাদের উদ্ধার চৈতন্যদেবের শক্তি ও প্রেমধর্ম্মেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে এবং যবন হরিদাস চৈতন্যসমাজের নূতন মানুষ। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার

করিতে বাধা যথেষ্ট পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি অভিনব উপায়ে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া সেই মহান প্রেম-ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। চৈতন্যদেবের অভিনব অস্ত্রটি হইতেছে সংকীর্ত্তন। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্ত্তনের উল্লেখ আছে। (১১. ৫. ২৯)। ডঃ সুশীল কুমার দে মনে করেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ কীর্ত্তনের জন্মদাতা না হইলেও, তাঁহারা প্রথমে কীর্ত্তনের প্রভাব অনুভব করিয়া কীর্ত্তনের সাহায্যে নিজেদের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। (৬) চৈতন্য-দেবই এই কীর্ত্তনের জন্মদাতা। শ্রীবাসের অঙ্গনে ইহার উৎপত্তি। সেদিনকার নগর সংকীর্ত্তনে হাজার হাজার লোক যোগ দিয়াছিল, জনসমুদ্র সুর ও নৃত্যের তালে মাতিয়া উঠিয়াছিল, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কাজী সকলেই সেই বন্যায় ভাসিয়া গেল। মানবতা ও প্রেমের বাণীর ভিতর দিয়া এই সংকীর্ত্তনের মধ্যেই বাঙালী চৈতন্য বাঙলার বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (খ)-এর প্রমাণপঞ্জী

(১) (ক) ভারতবর্ষের ইতিহাস—স্বদেশ—রবীন্দ্রনাথ

(খ) ভারতের সংস্কৃতি (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)—ক্ষিতিমোহন সেন—৩৪ পৃঃ

(২) Influence of Islam on Indian Culture by Dr. Tarachand— p. 110—112.

(৩) Do Do P. 43—44

(৪) Do Do Do

(৫) বাংলার নবজাগৃতি—বিনয় ঘোষ—১২৪ পৃঃ

(৬) Early History of the Vaisnava Faith and Movement,—Dr. S. K. De P. 335 F. N. 2

পরিশিষ্ট (গ)

আমরা পূর্ব্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাধাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির নির্য্যাস মহাভাবস্বরূপা। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ রসাস্বাদনের জন্য রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকার সহিত বৃন্দাবনে এই চিদানন্দময়ী রাসক্রীড়া করিযাছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই রাসলীলাই সর্ব্বলীলার মুকুটমণিস্বরূপ। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মনে করেন এই লীলা চিরন্তনকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার আদি-অন্ত কিছুই নাই। বৈষ্ণব রস-সাহিত্য অর্থাৎ পদাবলী-সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে হইলে এই সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখিতে হইবে এবং এই সিদ্ধান্তই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল কথা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না করিযা বা .রাধাতত্ত্বের প্রতি কোন অনাস্থা প্রদর্শন না করিয়া আমরা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে প্রাচীনতম সাহিত্যে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার যে পূর্ণ পরিণতি আমরা দেখিতে পাই সংস্কৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইঙ্গিত মাত্র আছে।

যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে মহাভারত প্রাচীনতম। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের নায়ক নহেন কিন্তু সময় সময় ঘটনার গতিপ্রবাহে তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। সেইজন্য মহাভারতের খিলপর্ব্বরূপে যে হরিবংশ রচিত হইয়াছিল—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশ ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও এই সকল পুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও রাসলীলার আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব কোন সময় হইতে রাধার উল্লেখ আরম্ভ হইয়াছে।

মহাভারতের কয়েকস্থানে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার (যেমন পুতনা বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ, অরিষ্ট ও ধেণুকাসুর বধ এবং কংস বধ) উল্লেখ আছে কিন্তু রাস বা রাধার কোন উল্লেখ নাই। সভাপর্ব্বে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে "গোঘ্ন" ও "স্ত্রীঘ্ন" বলিয়া গালি দিয়াছেন, কিন্তু তিনি গোপীগণের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট বা পরদারিক বলেন নাই, বা তিরস্কারের ছলে রাসেরও উল্লেখ করেন

নাই। তবে সভাপর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই যে কুরুসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী বিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিবার সময় "গোপীজনপ্রিয়" বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন—

আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যাশ্চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ! দ্বারকাবাসিন্! কৃষ্ণঃ! গোপীজনপ্রিয়ঃ॥

[কিন্তু পুণা হইতে সম্প্রতি যে মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পণ্ডিতগণ এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।]

হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বের বিংশ অধ্যায়ে রাসের বিবরণ আছে, যদিও 'রাস' শব্দটি নাই। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা "হল্লীষ" শব্দটি পাইতেছি—অধ্যায়ের শেষে এইরূপ লিখিত সূচি আমরা দেখিতে পাই "ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বাণি হল্লীষকক্রীড়নম্ নাম বিংশোঽধ্যায়।" হল্লীষ শব্দের অর্থ চক্রাকারে নৃত্য। হেমচন্দ্র হল্লীষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "মণ্ডলেন চ যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকং তু তৎ।" নীলকণ্ঠ হল্লীষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "গোপীনাং মণ্ডলীনৃত্যবন্ধো হল্লীষকং বিদুঃ।" হরিবংশ ছাড়া, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এবং পদ্মপুরাণেও রাসের বিবরণ আছে; কিন্তু ঐসকল পুরাণে হল্লীষের পরিবর্ত্তে রাস কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

হরিবংশের বিংশ অধ্যায়ে হল্লীষের বিবরণ যাহা দেওয়া আছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের কান্ত ছিলেন, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান অবহেলা করিতে না পারিয়া, পতি, ভ্রাতা ও মাতার বারণ সত্ত্বেও রাত্রে তাহার সহিত মিলিত হইতেন।

এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলংকৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥ (২৯৷৩৫)

হরিবংশে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদি বর্ণিত আছে, কিন্তু রাধিকার কোন উল্লেখ নাই এবং রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন তাহারও কোন উল্লেখ নাই। নীলকণ্ঠ রাসের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই "চক্রবালৈঃ মণ্ডলৈঃ হল্লীষকক্রীড়নং একস্য পুংসো বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ ক্রীড়নমেব রাসক্রীড়া।"

ব্রহ্মপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা আছে এবং তাহা হরিবংশের অনুসরণে লিখিত; এই উভয় পুরাণেই একটি নূতন রসসম্পাত দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্দ্ধান।

গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টা-ভ্যায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশগতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্॥

[শ্রীকৃষ্ণ অন্য দেশে অন্তর্হিত হইলে গোপীরা তাহার চেষ্টার অনুকরণ করিয়া দলে দলে বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।]

বিষ্ণুপুরাণে আর একটি নূতন রসসঞ্চার আমরা দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বনে বনে গোপীগণ ভ্রমণ করিতেছেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত অন্য চরণচিহ্ন দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত অন্য কোন সুকৃতিকারিণীর চরণচিহ্ন মিলিত হইয়াছে। রাস-মণ্ডলী হইতে অন্য আর এক গোপীসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের কথা হরিবংশ বা ব্রহ্মপুরাণে উল্লেখ নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। ভাগবত পুরাণে বিষ্ণুপুরাণের উক্ত অন্তর্দ্ধানের বিষয় গ্রহণ করা হইয়াছে এবং নূতন রসসম্পাত করা হইযাছে—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত এক রমণীর পদচিহ্ন লক্ষ্য করিযা বলিলেন, এই রমণী শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আরাধনা করিয়াছিল সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিযা ইহার সহিত নির্জ্জন স্থানে গিয়াছেন।

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

ভাগবত পুরাণে ইহার পরে বলা হইয়াছে যে উক্ত রমণীর দৌরাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন ও উক্ত কামিনী বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় অন্য গোপীগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইযা সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান আরম্ভ করিলেন।

হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ এমন কি ভাগবতেও রাধিকার নাম নাই; ভাগবতে 'অনয়া রাধিতো নূনং' এই কথাগুলি মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে রাধার প্রেম 'সাধ্য শিরোমণি 'এবং

সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥

তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥

* * *

শতকোটী গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপন।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥ (চৈ. চ. মধ্য. ৮ম পঃ)

সুতরাং রাসেশ্বরী রাধাকে যদি বাদ দেওয়া যায় তবে রাসবিহারের কোন অস্তিত্বই থাকে না—

রাধাসহ সদা ভাতি তদা স মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥
(গোবিন্দ লীলামৃত ৮।৩২)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে রাসের বিবরণে রাধা কবে প্রবেশ করিলেন? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় কিন্তু রাসলীলার কোন উল্লেখ নাই; হরিবংশে রাসলীলার বর্ণনা আছে কিন্তু রাস শব্দ নাই, উহা হল্লীষ ক্রীড়া। ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে আমরা রাসলীলার বিশদ বর্ণনা পাই এবং ভাগবতে রাসলীলার পূর্ণ বিকাশ। ভাগবত পুরাণেও রাধার উল্লেখ নাই। আমরা অতঃপর আরও দেখিতে পাইয়াছি যে ক্রমশঃ এই রাসলীলাতে নূতন রেখা সম্পাত হইতেছে। যেমন হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের কথা নাই; ব্রহ্মপুরাণে নূতন রেখাসম্পাত হইল যে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন; এবং বিষ্ণুপুরাণে আবার নূতন তথ্য পাওয়া গেল যে রাসমণ্ডলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাদের মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত অন্য কোন সুকৃতিকারিণীর চরণচিহ্ন মিলিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের এই অপর পদচিহ্ন গোপীদের ঈর্ষ্যাপ্রসূত কল্পনাও হইতে পারে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে ইহা প্রকৃত ধরিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষেই একজন রমণীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং পরে সেই রমণীকেও ত্যাগ করেন। অন্য গোপীগণ পরে সেই রমণীর সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগান করিলে শ্রীকৃষ্ণ আবার সকলের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু ভাগবত পুরাণেও রাধার কোন উল্লেখ নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আমরা রাধার উল্লেখ পাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে রাসের বর্ণনা আছে। মধুমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথাকার মনোমুগ্ধকর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং গোপীদিগের আনন্দবর্দ্ধক বংশীরব করিলেন। সেই মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া রাধা কামাতুরা হইযা মূর্চ্ছা গেলেন এবং পরে কোন রকমে আত্ম-সম্বরণ করিয়া সেই বংশীরবের অনুসরণ করিলেন এবং রাসমণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখিয়া মদনাতুর হইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং উভযে রতিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায—

এতস্মিন্নন্তরে তত্র সকামঃ সুরতোন্মুখঃ।
সুস্বাপ রাধযা সার্দ্ধং রতিতল্পে মনোহরে॥
শৃঙ্গারাষ্টপ্রকারাঞ্চ বিপরীতাদিকং বিভুঃ।
নখদন্তকরণাঞ্চ প্রহারঞ্চ যথোচিতং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডের ৫২ ও ৫৩ অধ্যায়েও রাধাকৃষ্ণের বিহার-বর্ণনা করা হইযাছে—সেখানেও রতিক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণব-রসসাহিত্যের মহাভাবমযী রাধার কোনরূপ ইঙ্গিত সেখানে পাওযা যায না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধা যদিও রাসেশ্বরী তথাপি পূর্ব্ববর্তী পুরাণে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ভাগবত বর্ণিত রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য গোপীগণের সহিত বিহারের বর্ণনাও আছে—

"রেমে গোপাঙ্গনাভিশ্চ সুরম্যে রাসমণ্ডপে"

পদ্মপুরাণে রাসের বর্ণনা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের তুলনায় লঘু ও তরল। সেখানেও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিযা গোপবধূগণ পতি, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও কুল পরিত্যাগ করিয়া রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসমণ্ডপে মিলিত হইয়াছিলেন। পদ্মপুরাণ-মতে এই সমস্ত গোপীগণ পূর্ব্বজন্মে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি ছিলেন; তাঁহারা রামরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহারা গোপীভাবে জন্মগ্রহণ করিযা তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের ৪০ অধ্যায়ে রাধার উল্লেখ আছে। সেখানে রাধার আসন অনেক উর্দ্ধে; কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে স্বয়ং নারদ সেই ভাবময়ী কৃষ্ণবল্লভাকে দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ রাধাকৃষ্ণ প্রেমের যে অদ্বিতীয়ত্ব প্রমাণ করিয়াছেন—"রাধয়া মাধবোদেবঃ

মাধবেনৈব রাধিকা" পদ্মপুরাণ-ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের যুগে সে ভাব তখনও পরিস্ফুট হয় নাই।

মহাকবি ভাস তাঁহার বালচরিতম্ নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, উদুখলে বন্ধন, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, ধেণুক-কেশীবধ ও কালীয়দমন, বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে জনৈক দামক তাঁহার বৃদ্ধ মাতুলকে উদ্দেশ করিযা বলিতেছেন—"অদ্য ভর্ত্তা দামোদর এই বৃন্দাবনে গোপকন্যাদিগের সহিত হল্লীষক ক্রীড়া করিতে আসিতেছেন।" তাহাতে সেই বৃদ্ধ গোপ উত্তর করিলেন—"ভাল,ভাল সমস্ত গোপগণের সহিত ভর্ত্তা দামোদরের হল্লীষক দেখিব।" সুসজ্জিতা গোপকন্যাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ হল্লীষক নৃত্য করিলেন এবং সেই বৃদ্ধ গোপ ও অন্যান্য গোপগণ মাদল বাজাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। ইহা প্রকাশ্য নাচ এবং সমস্ত প্রকার কামগন্ধ-বিহীন। মহাকবি ভাসের সময় লইয়া বহু তর্ক বিতর্ক আছে কিন্তু ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে তিনি মহাকবি কালিদাসের এমন কি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকেরও পূর্ব্ববর্তী।

কিন্তু ভাসের কাব্যে হল্লীষক বা রাসের উল্লেখ পাইলেও রাধার উল্লেখ পাইতেছি না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভাগবত পুরাণেও রাধার উল্লেখ নাই। ডঃ ভিণ্টারনিসের মতে ভাগবত পুরাণ খ্রীঃ দশম শতকে রচিত হইযাছিল। (১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কাল আরও পরে এবং পদ্মপুরাণ তাহার পরে রচিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পর রচিত হইয়াছিল। (২) সুদূর প্রাচ্যে ভারতীযগণ যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—চম্পারাজ্য তাহাদের মধ্যে অন্যতম। চম্পারাজ্যে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও বিষ্ণুর পূজাও প্রচলিত ছিল। চম্পারাজ্যে বিষ্ণু নারায়ণ, হরি, গোবিন্দ, মাধব, পুরুষোত্তম, বিক্রম এবং ত্রিভুবনাক্রান্ত নামেও পূজিত হইতেন। চম্পারাজ্যের শিলালেখ হইতে বিষ্ণুর অবতার রূপে রাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ বার বার পাওযা যায়। কৃষ্ণ অবতারে বিষ্ণু যে সমস্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ দেখা যায়। গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণের প্রতি-মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। (৩) কিন্তু বৃন্দাবনের মধুর লীলার পরিচায়ক কোন মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। চম্পার প্রথম ঐতিহাসিক রাজার নাম শ্রীমার এবং তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে চম্পায় রাজত্ব করেন। (৪) ভারতীয়গণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কাহিনী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহাতে বৃন্দাবনের

মধুর লীলার স্থান ছিল না বলিয়াই মনে হয়। রাধা ও কৃষ্ণের নিত্যলীলা যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্য সমাজ ও সাহিত্য কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুইখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুরী মানস নয়নে হেরিয়াছিলেন তাহাই কর্ণামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কর্ণামৃত ১১২ শ্লোকে সমাপ্ত। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে "লক্ষ্মীকটাক্ষ-দৃতাম্", "কালিন্দীপুলিনাঙ্গন প্রণয়িনং", "বল্লবী-কুচকুম্ভকুঙ্কুম পঙ্কিলং", "বল্লবীবিভু" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী দর্শন করিতেছেন তথাপি কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছাড়া রাধার উল্লেখ আর কোথাও করেন নাই—

তেজসেঽস্তু ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গ-শায়িনে শেষ-শায়িনে॥ (কর্ণামৃত ৭৬ নং)

খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে রাধার উল্লেখ না পাইলেও আমরা দশম শতকের পূর্ব্বের প্রাকৃত সাহিত্যে রাধার উল্লেখ পাই। কবি হাল সাতশত প্রাকৃত কবিতা সংগ্রহ করেন এবং উহা গাথা সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিযাছেন :—

লীলা হিতুলিঅ সৈলো রকৃখ উবো
রাহিযা থণপ.ফং সো হরিণো পঃঢ়ম
সমাগম সজ্.ঝম বেবল্লিও হত্থো॥

[শ্রীকৃষ্ণের যে হস্ত শৈল উত্তোলন করিয়াছিল, সেই হস্ত প্রথম সমাগম নিমিত্ত ভয়ে শ্রীরাধার স্তন স্পর্শে কম্পিত হইল, সেই হস্ত তোমাদিগকে রক্ষা করুন।]

হাল-সপ্তশতীর নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে আমরা পদাবলীর রাধা ও কৃষ্ণকে পাইতেছি :—

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতানং বল্লবীণং অন্নাণ বি গোর অং হরসি॥ (১।৮৯)

[হে কৃষ্ণ তুমি মুখ মারুতের সাহায্যে রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ দূর

করিয়া অন্য গোপীগণের গৌরব হরণ করিতেছ, গোরঅ=গোরজ=গোষ্ঠের ধূলি এবং গোরঅ=গৌরব]

হাল কোন্ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে মতভেদ আছে। ডঃ ম্যাকডোনেল মনে করেন কবি হাল খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। (৫)। শ্রীহারিতকৃষ্ণ দেব মনে করেন যে গাথা সপ্তশতীর সংগ্রহকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। (৬) ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সপ্তশতীর প্রাকৃত কবিতাগুলি ভাগবত পুরাণ রচিত হইবার পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্য ও সাহিত্যের সহিত সপ্তশতীর নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীসনাতনগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামী পরকীয়া প্রেমের স্থান শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে মহাদেবী, রুক্মিণী প্রভৃতির প্রেম অপেক্ষা ব্রজদেবীগণের প্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলা হইয়াছে। প্রাকচৈতন্য যুগে পরকীয়া প্রেমকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয় নাই। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য এই পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়াছে। গাথা সপ্তশতীতে অবশ্য প্রাকৃত প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে আর বৈষ্ণব আচার্য্য ও মহাজনগণ অপ্রাকৃত প্রেমের কথাই বলিয়াছেন। দুই একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর উপর সপ্তশতীর কত প্রভাব তাহাই দেখাইতেছি। (অপ্রাসঙ্গিক হইলেও লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।)

বিরহে বিসং ব বিসমা অমঅ মআ হোই সংগমে অহিঅম্।
কিং বিহিণা সমঅং বিঅ দোহিং বি পিয়া বিণিম্মিঅআ॥

[প্রিয়া বিরহে গরল ও মিলনে অমৃত, বিধি কি উভয় মিশ্রণ করিয়া তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন]

ইহার সহিত চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির তুলনা করা যাইতে পারে—

(১) নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ।
(২) কানুর পিরীতি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়।
(৩) কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।

ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

কবিরাজ গোস্বামীর মতে প্রেম "বিষামৃতে একত্র মিলন", বিদ্যাপতিও অনুরূপ বলিয়াছেন—

তোঁহে বড় নাগর ও বড় ভোরী।
অমিয় পিয়ও লহ বিষ সৌ ঘোরী॥

(সাঃ পঃ সং পদাবলী ৫১৭)

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী লইয়া বহু পূর্ব হইতেই গাথা বা গীত রচিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার পরিচয় না পাইলেও গণসাহিত্যে তাহার আদর ছিল। আর দাক্ষিণাত্যেই এই সাহিত্যের আদর অধিক ছিল। উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্ম্মের সূচনা হইলেও ঐতিহাসিক যুগে দাক্ষিণাত্যে ইহার অধিক প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে বহু মহাজন কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলা দেশে ভক্তির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে—রাজনৈতিক কারণও এবিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। সেই সঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলার সংশ্লিষ্ট সাহিত্যও এদেশে প্রসার লাভ করিয়াছে। ডঃ সুশীল কুমার দে মনে করেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের কামগায়ত্রী গ্রহণ ও শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে কল্পনা করার ভিতরে খুব সম্ভবতঃ তান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। (৭) উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরূপগোস্বামীও বলিয়াছেন রাধা ইতিপূর্ব্বেই তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইযাছেন—

হ্লাদিণী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

(উ. নী—রাধাপ্রকরণ, ৪)

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন যে শাক্তধর্ম্ম কর্ত্তৃক বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভাবান্বিত হইযাছে এবং শ্রীরাধিকা শাক্তের শক্তিস্বরূপা। (৮)

"শ্রীরাধার ক্রমবিকাশঃ দর্শনে ও সাহিত্যে" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত আলোচনা করিয়াছেন।

হালের গাথা সত্ত-সঈতে শ্রীরাধার উল্লেখ থাকিলেও অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অষ্টমশতকে রচিত ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নামক নাটকের নান্দীশ্লোকে শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া

যায়। সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীরূপে রাধা প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার উল্লেখ খুব বেশী জায়গায় পাওয়া যায় না। ডঃ দাশগুপ্ত মনে করেন সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার হইয়াছে এবং সাহিত্যাদি হইতে উজ্জ্বল রসের মাধ্যমে শ্রীরাধা ধর্ম্মমতে প্রবেশ করিযা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিযাছেন। ডঃ দাশগুপ্ত আরও মনে করেন যে, ভারতবর্ষের শক্তিতত্ত্বের ভিতরই শ্রীরাধাতত্ত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে।

তাঁহার প্রসিদ্ধ "বোধবণিক উপাখ্যান" গ্রন্থে ৺যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় রাধাকৃষ্ণের জ্যোতিষতত্ত্ব উল্লেখ করিযাছেন। তাঁহার মতানুসারে গো=রশ্মি; গোপ=শ্রীকৃষ্ণ=সূর্য; গো—পী=তারকা; বিশাখা তারকা=রাধা কৃষ্ণ=সূর্য রাস মধ্যস্থ ও গোপী (তারকারা) মণ্ডলাকারে ঘিরিযা আছে। অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্যের মিলন—শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গমন।

পরিশিষ্ট (গ)-এর প্রমাণ-পঞ্জী

(১) A History of Indian Literarure by M. Winternitz (C. U. P.) P. 556.

(২) রাসলীলা—হীবেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন—৮০ পৃঃ।

(৩) Ancient History of Champa by Dr. R. C. Majumdar. P. 193, 194.

(৪) Do Do P. 22.

(৫) History of Sanskrit Literature by Dr. A. A. Macdonell, P. 344.

(৬) হরপ্রসাদ সম্বর্দ্ধন লেখমালা—২য় ভাগ।

(৭) Early History of the Vaisnava Faith & Movement—Dr. S. K. De. P. 21—22

(৮) বাঙালার ইতিহাস (আদি পর্ব্ব)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—৬৬২ পৃঃ।

পরিশিষ্ট (ঘ)

সহজিয়া মত যাহারা অনুসরণ করেন তাঁহারা 'রস'কেই মূলত অবলম্বন করেন এবং তাঁহারা রূপধর্ম্মী বলিয়া সাধারণত তাঁহাদের সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার সহিত অভিন্ন বলিয়া ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু সহজিয়া-দর্শনের সহিত পরিচিত থাকিলে এ ধরণের ভুল করিতে পারা যায় না। সহজ সাধনা ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা নহে।

সহজিয়াদের মতে 'রস' মনের জিনিষ এবং যিনি প্রকৃত রসিক তাঁহাকে দ্রষ্টার পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইতে হয়, ভোক্তার পর্য্যায়ে নহে। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনের জন্য, সহজিয়াগণ তাহা হইতে ধার করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন—চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (১)।

জন্মাবধি যে স্বাভাবিক ভাব পোষণ করা যায় তাহাই সহজ। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইল প্রেম। এই প্রেমের সার্থকতা ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও দেহের সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্ক। সহজ ভজনের মূল কথাই হইল এই দেহাশ্রিত প্রেমের সাধনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের লীলা অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সহজিয়া মতে—এই অপ্রাকৃত যুগল প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই তাঁহাদের প্রাকৃত লীলা করিতেছেন। প্রত্যেক নারীই রাধিকা—সহজের আস্বাদ্যরূপ রতি এবং প্রত্যেক পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ—সহজের আস্বাদকরূপ রস। সহজিয়াদের কাছে এই জড়দেহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং এই দেহের সম্যক তত্ত্ব লাভ করিতে পারিলেই মনের নির্ব্বিকারত্ব লাভ হয়। পরমতত্ত্বই এই জড়দেহ এবং প্রাকৃত প্রেমের আস্বাদনের ভিতর দিয়াই প্রকৃত প্রেমের আস্বাদন পাওয়া যায়। নরনারীর মিলনে যে আনন্দ সেই আনন্দ হইতেই পরম আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই যে মিলন তাহার স্বরূপ এইভাবে বলা হইয়াছে—

নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা।

সহজিয়াগণ মানুষকেই প্রেমাস্পদ করিয়াছিলেন এবং মানুষের প্রেমের

ভিতর দিয়াই পরম প্রেমাস্পদ ভগবানের প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেইজন্ত তাঁহারা বলেন—

মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ ধন ॥

কিন্তু এ-কথা তাঁহারা সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই, 'সহজ' মানুষকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

যে জনা মানুষ সে জানে মানুষ
মানুষে মানুষ চিনে।

তাঁহারা যে প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কামগন্ধহীন।

হিয়ার ভিতরে যাহার বসতি
তাহার উপরে কে।
তাহার উপরে প্রেমের বসতি
সে কথা বুঝিবে কে ॥

দেহের সাধনা করিয়া পরমতত্ত্ব লাভ করা যায় ইহাই সহজিয়া মতবাদ; এই দেহসাধনার গূঢ় তত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারাই কেবল মাত্র সহজ সাধনের উপযুক্ত। সেই গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন,

মরম না জানে ধরম ব্যাখ্যানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা ॥

এই সহজ সাধনে বহির্জগতের মূল্য বেশী নাই। ইহা "অন্তরস্ফুট ধর্ম্ম" "বহিস্ফুট নয়।" তাই যাঁহারা অন্তরঙ্গ, তাঁহারাই শুধু সহজিয়া প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে পারেন—

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড়া হইয়া আয়লো সজনি
আঁধার পেরিয়া আলা ॥

এই সজনি বা সখি লইয়া সহজিয়াগণ প্রেমতত্ত্ব অনুশীলন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রেমতত্ত্ব পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব। স্বকীয়া প্রেম বলিতে আমরা বিবাহজ প্রেম এবং পরকীয়া বলিতে বিবাহের সম্বন্ধ ছাড়া যে প্রেম

তাহাই বুঝি, কিন্তু সহজিয়াগণ স্বকীয়া ও পরকীয়া শব্দের অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বকীয়া অর্থে সকাম সাধনা ও পরকীয়া অর্থে নিষ্কাম সাধনা মনে করেন। তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা বলেন যে, পরকীয়া হইতে স্বকীয়া শ্রেষ্ঠ; এবং ইহার অর্থ তাঁহারা এইভাবে করিয়া থাকেন যে, বাহিরের দেবতার পূজা করা অপেক্ষা আত্মোপলব্ধির জন্য সাধনা করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। (২) কিন্তু পরকীয়া প্রেমের সহিত সখীসাধনার তত্ত্ব আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়ায় নারী লইয়া সাধনা সহজ সাধনার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার বাঙালীর ইতিহাসে (আদিপর্ব্ব) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সখীসাধনার মূলে তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষিত হয়। তন্ত্রমতে কায়াসাধনার পাঁচটি কুল আছে—ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী, রজকী, ডোম্বী ও শবরী। ইহারা মানবী নহেন। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ যে ডোম্বী, চণ্ডালী এবং সহজিয়া চণ্ডীদাস রজকীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের সাধন-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন—ইহারা তাঁহাদের কুল (৩)।

পরিশিষ্ট (ঘ) এর প্রমাণ-পঞ্জী।

(১) ও (২) সহজিয়া সাহিত্য (ভূমিকা)—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।
(৩) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব্ব)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। ৫৩৯ পৃঃ।

পরিশিষ্ট (ঙ)

পঞ্চতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস ও শ্রীগদাধর।

কবি কর্ণপুর হইতে আমরা জানিতে পারি যে স্বরূপদামোদর এই পঞ্চতত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন। কর্ণপুরের গৌড়গণোদ্দেশদীপিকা ও গৌড়ীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক লিখিত মহাপ্রভুর জীবনীসমূহে এই তত্ত্বের প্রতি উল্লেখ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ এই তত্ত্বকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা এই তত্ত্ব, এমন কি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বিশেষ উল্লেখও করেন নাই। বৈষ্ণবতোষিণীতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তবৃন্দ হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া বিশেষভাবে

সম্মান দেখান হয় নাই। লোচনদাস আবার শ্রীবাস আচার্য্যের স্থলে শ্রীগুরু নরহরি সরকারের নাম পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত করিয়াছেন।

পঞ্চসখা—শ্রীচৈতন্যদেবের উড়িয়া ভক্তগণের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচজনকে পঞ্চসখা বলা হয়—(১) বলরাম দাস (২) জগন্নাথ দাস (৩) অচ্যুতানন্দ ঘুন্টিযা (৪) যশোবন্ত মল্লিক ও (৫) অনন্ত মোহান্তি।

অষ্টসখী—ব্রজলীলার অষ্টসখীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সময় নবদ্বীপে যিনি যে নামে পরিচিত হইতেন, তাহা দেওয়া গেল।

ব্রজলীলায	গৌরাঙ্গলীলায
ললিতা	শ্রীরূপ গোস্বামী
বিশাখা	শ্রীরামানন্দ রায়
সুমিত্রা	শ্রীশিবানন্দ সেন
চম্পকলতা	শ্রীরাঘব পণ্ডিত
রঙ্গদেবী	শ্রীগোবিন্দ ঘোষ
সুন্দরী	শ্রীবাসুদেব ঘোষ
তুঙ্গদেবী	শ্রীমাধব ঘোষ
ইন্দুরেখা	শ্রীগোবিন্দানন্দ

নবমঞ্জরী—সেবার প্রকার ভেদে ব্রজ-গোপীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) সখী ও (২) মঞ্জরী। যাঁহারা প্রায় রাধিকার সমান সেবায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন, তাহাদিগকে সখী বলা হয়। যেমন উপরোক্ত ললিতা বিশাখা প্রভৃতি। যাঁহারা নিজাঙ্গ দ্বারা সেবা করিতে চাহেন না, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মিলনের ও সেবার অনুকূল কাজ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে মঞ্জরী আখ্যা দেওযা হয। তাঁহারা রাধিকার অন্তরঙ্গা এবং এই অন্তরঙ্গা সেবায় সখী অপেক্ষা মঞ্জরাদের অধিকার অনেক বেশী। ব্রজলীলার নবমঞ্জরীগণ গৌরাঙ্গলীলায যিনি যে ভাবে অভিহিত হইতেন তাহার পরিচয় নীচে দেওয়া হইতেছে—

ব্রজলীলায	গৌরাঙ্গলীলায
শ্রীরূপমঞ্জরী	শ্রীরূপগোস্বামী
শ্রীনবমঞ্জরী	শ্রীসনাতনগোস্বামা
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী	শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী
শ্রীরসমঞ্জরী	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

শ্রীবিলাসমঞ্জরী	শ্রীজীব গোস্বামী
শ্রীপ্রেমমঞ্জরী	শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী
শ্রীলীলামঞ্জরী	শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী
শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী	শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী

দ্বাদশ গোপাল—

পূর্ব্ব লীলায	গৌরাঙ্গলীলায
শ্রীদাম	অভিরাম ঠাকুর
সুদাম	সুন্দর ঠাকুব।
দাম	পুরুষোত্তম নাগ
বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত
সুবল	গৌরীদাস পণ্ডিত
মহাবল	কমলাকব পিপলাই
সুবাহু	উদ্ধারণ দত্ত
মহাবাহু	মহেশ পণ্ডিত
অর্জ্জুন	পবমেশ্বব দাস
লবঙ্গ	(কালা) কৃষ্ণদাস
শ্রীমধুমঙ্গল	(খোলা বেচা) শ্রীধর পণ্ডিত
প্রবাল	হলাযুধ ঠাকুর

অষ্ট কবিরাজ—

ব্রজলীলার যে যে সখীগণ শ্রীগৌরাঙ্গেব সময়ে অষ্ট কবিরাজ বলিযা অভিহিত হইতেন তাঁহাদেব নাম—

ব্রজলীলায়	গৌরাঙ্গলীলায
সুলোচনা	রামচন্দ্র কবিরাজ
ভাণ্ডোদেবী	গোবিন্দ কবিরাজ
গোপালী	কর্ণপুব কবিরাজ
সুচণ্ডিকা	নরসিংহ কবিরাজ
সরস্বতী	ভগবান কবিরাজ
বগলা	বল্লভদাস কবিরাজ
সুতারা	গোকুল চন্দ্র কবিরাজ
কস্তুরা	কৃষ্ণদাস কবিরাজ

পরিশিষ্ট (চ)

বৈষ্ণব সাহিত্যকে সাধারণভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :—জীবনী কাব্য, পদাবলী সাহিত্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্র। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী অপূর্ব সম্পদ—রূপ ও রসের এরূপ অনবদ্য মিশ্রণ অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণব রস শাস্ত্রের অনুগামী এইসব পদাবলী; ভক্ত কবিগণের ভক্তির রসে আপ্লুত হইয়া এই পদাবলী সাহিত্য রসশাস্ত্রের নাগ পাল ছিন্ন করিয়া ভক্তজন তথা গণমনের আসরে চিরকালের জন্য স্থান লাভ করিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রসশাস্ত্র সম্বন্ধে আভাস দিয়াছি; এখানে শুধু জীবন কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের জীবন লইয়া বাংলা ভাষায় যে সমস্ত কাব্য রচিত হইযাছে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

বাংলা সাহিত্যে তথা ভারতীয় বৈষ্ণবজীবনী কাব্য সমূহ এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা যদিও দেবতারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা মনুষ্য-ধর্মী। বৈষ্ণব জীবনী কাব্যসমূহ ধার্মিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ ভাবে মানুষের জীবনচরিত নহে; বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেবের জীবনী-সমূহ অবতারবাদের জন্য অলৌকিক প্রভাব মুক্ত নহে। কিন্তু জীবনী-লেখকগণ রক্তমাংসের গড়া গৌরাঙ্গ দেবকে একেবারে উড়াইযা দিতে পারেন নাই; সেই জন্য সেইসব জীবনকাব্য সমূহে মানুষের জীবনকথা তাহার সুখ, দুঃখ, গৃহ, সমাজ এবং সমসাময়িক পরিবেশ প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। দেব চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রাণ ও মন সাড়া দেয় না। যে জীবনী শুধু অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ তাহা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণবজীবনী কাব্য-সমূহে মানুষের কথাই বড়। জীবনীকাব্য রচযিতাগণ চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেও তিনি যে এ জড় জগতের মানুষ তাহা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। সেই কারণেই বৈষ্ণবজীবনী কাব্যসমূহ বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্যসমূহ ভক্তি কাব্য ও ধর্মের প্রভাবশূন্য না হইয়াও সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সাহিত্য রসপিপাসু রসিক সমাজে সেইজন্য চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য সমূহ

একালেও সমাদর লাভ করিয়াছে। চৈতন্য জীবনীকাব্যসমূহে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে।

চৈতন্যদেবের জীবনী রচিত হইবার পূর্বেই তাঁহার সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ তাঁহার সম্বন্ধে "পদ" রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত ও বংশীবদন, কাঞ্চন পল্লার শিবানন্দ সেন ও তাঁহার পুত্র কবিকর্ণপুর, কুলাই গ্রামের বাসুঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ এবং কুলীন গ্রামের বসু রামানন্দ দৃষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইযাছেন। উদ্ধব দাস প্রভৃতি আরও অনেক সমসামযিক ভক্ত চৈতন্যদেব সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন। নরহরি সরকার প্রভৃতি প্রাগুক্ত নযজন পদ কর্তার পদে গৌরাঙ্গ সুন্দরের রূপ ও ঐশ্বর্য ভাব ফুটিযা উঠিয়াছে কিন্তু চৈতন্যদেবের তীব্র আকুলতা ও উন্মাদনা ফুটিযা উঠে নাই। গৌর-পদ-তরঙ্গিনী পাঠ করিলে এই সমস্ত পদেব রসমাধুরী উপলব্ধি করা যাইবে।

সমসামযিক পদ কর্তাদের পর সংস্কৃত ভাষায রচিত মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয' নাটক ও 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' মহা-কাব্যের নাম করিতে হয। মুরারি গুপ্ত নবদ্বীপ লীলায় চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পরিকর ছিলেন এবং ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় চৈতন্য-দেবের নবদ্বীপ লীলা সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের বর্ণনাই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিযাছেন। কবিকর্ণপুরের জীবনী দুইটি হইতেও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওযা যায।

বাংলা ভাষায রচিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয় ও আদরণীয গ্রন্থ আর নাই। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন উহা ১৫৪৬ খ্রী অব্দ হইতে ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইযাছিল। বৃন্দাবন দাস পৌরাণিক নীতি অবলম্বন করিযা চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন ও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে ইহাতে বর্ণিত হইযাছে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ পর্যন্ত তাঁহার জীবনের ঘটনা সমূহের জন্য এই গ্রন্থই প্রামাণ্য হিসাবে ধরা যায়। নীলাচল, দাক্ষিণাত্য বা উত্তর ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ্য নহে এমনকি চৈতন্যদেবের নীলাচল ভক্তদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহ ও প্রেরণায় বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন

চৈতন্যদেবের লীলা প্রচার করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গৌণ ভাবে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি চৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণকে অভিন্ন মনে করিয়া ভাগবত পুরাণ অনুসরণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং পয়ারের গতি কখনও ভঙ্গ হয় নাই। অলৌকিক ঘটনা প্রবাহের ভিতরেও তিনি গৌরাঙ্গদেবের জীবনের নানাবিধ সহজ ঘটনা সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রচিত জীবনী মানবতা রসে সিঞ্চিত বলিয়াই মনের তরঙ্গে সহজ ভাবে আঘাত করে। চৈতন্য ভাগবতে তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে আমরা বহু তথ্য পাই। বাঙ্গালীর 'মঙ্গল গান' 'টোল' ও টোলের পড়ুয়াদের চিত্র এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সংঘাত এই সমস্তই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে সুন্দর ভাবে ফুটিযা উঠিয়াছে।

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন চৈতন্য ভাগবত রচিত হইবার পরই জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন এবং 'চৈতন্য ভাগবত' রচিত হইবার ১০।১২ বৎসরের মধ্যে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিযা তিনি মনে করেন।

জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয নাই। তাহার প্রধান কারণ মনে হয় তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুযায়ী চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করেন নাই। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তিনি যে সব তথ্য দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ভ্রমপ্রদ। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে তিনি লৌকিক কারণ বলিয়াছেন। তবে জযানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ষোড়শ শতকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বহু তথ্য পাওয়া যায়।

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন যে ১৫৬০-১৫৬৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে লোচনদাস তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করেন।

মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'কড়চা'র অনুসরণ করিযা লোচন দাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিলেও লোচন দাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার গুরু শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার প্রবর্তিত নাগরী ভাবের উপাসনাকে জনপ্রিয় করা। চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া তাঁহাকেই রসশেখর নাগর রূপে ভজনা করা, ইহাই নাগরীভাব এবং লোচন দাস এই রসমধুর ভজনার প্রবর্তন

করেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস এইরূপ ভজনার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এইরূপ সাধনাকে বার বার নিন্দা করিয়াছেন। লোচন দাস নাগরী ভাবের উপাসক সেই জন্য নবদ্বীপ লীলাই তাঁহার গ্রন্থে ভাল বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতে গৌরাঙ্গ সুন্দর একমাত্র উপায় কেবলমাত্র উপেয় নহে। লোচন দাসের রচনা অলঙ্কার বহুল এবং তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করিতে পটু।

ইহার পর কালক্রম হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে'র উল্লেখ করিতে হয়। এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। দার্শনিক চিন্তার গভীরতাও অধ্যাত্মিক অনুভূতির এইরূপ রসঘন সমাবেশ বাংলা সাহিত্যে আরও একটি আছে কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার ভক্ত হৃদয়ের তীব্র আধ্যাত্মিক অনুভূতি মিলিয়া এই গ্রন্থ জ্ঞানভক্তির অপূর্ব মিশ্রণ হইয়াছে। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদের যে রসঘন চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা আজও বাঙালীর মনে সাড়া জাগায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা বর্ণনা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও মানুষ চৈতন্যকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভিতরে আমরা রক্তমাংসের গড়া নিমাইকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। কাব্য, দর্শন, বিষয় মহাত্ম্য, অপূর্ব তথ্য-নিষ্ঠা, প্রসাদ-গুণ ও সরল বাক্যবিন্যাস প্রভৃতির সমন্বয়ে এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

এই গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া পণ্ডিত মহলে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন ইহা ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া কৃষ্ণদাস মনে করিতেন সেই সঙ্গে তিনি চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিতরূপ—বাহিরে রাধারাণী অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতেন (তুঃ 'গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন' চৈ. চ মধ্য ৮ম অঃ)। চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রাহ্য শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, ভক্তি সাধনের ক্রম, সাধ্যসাধন তত্ত্ব প্রভৃতি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় জনসমাজে ঐ সব তত্ত্ব প্রচার করাই তাঁহার গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্বরূপ দামোদরের কড়চা, মুরারী গুপ্তের কড়চা এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত হইতে তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্বীকৃতি আছে। কিন্তু তিনি উল্লেখ না

করিলেও কবি কর্ণপুরের দুইখানি গ্রন্থ হইতে তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা সহজ, সরল ও নিরলঙ্কার অবশ্য বিষয়ের কাঠিন্যের জন্য কোন কোন জায়গায় তাহা দুরূহ হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি কঠিন কঠিন তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়াছেন :

(১) অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

(২) মৃগমদ তার গন্ধে যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নিজ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই রূপ॥

(৩) কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুভ্র বস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব চরিতামৃতের সর্বত্রই ছড়াইয়া আছে। তবে চারি জায়গায় যথা—(১) সার্বভৌমের সহিত শ্রীচৈতন্যের বিচার (২) রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথন (৩) শ্রীরূপ গোস্বামীকে উপদেশ ও (৪) শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে এই তত্ত্ব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কাল পর্যায়ে এই গ্রন্থের পর গোবিন্দ দাস বা কর্মকার রচিত কড়চার উল্লেখ করিতে হয়। কড়চার প্রামাণিকতা লইয়া পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। যদি কড়চার কোন কোন অংশ প্রামাণিক বলিয়া ধরা যায় তবে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়।

চৈতন্যের জীবনীর মতন অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতির কথা বৈষ্ণব সমাজে আদৃত। স্বতন্ত্র ভাবে অদ্বৈতাচার্য ও তাঁহার স্ত্রী সীতা দেবীর জীবনী বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশান নাগর অদ্বৈত প্রকাশ নামে অদ্বৈতের

জীবনী রচনা করেন। 'অদ্বৈত প্রকাশ' কাব্য হিসাবে উপাদেয় এবং এই গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতকে রচিত নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেম বিলাস' ও অষ্টাদশ শতকে রচিত নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থ দুইটি উল্লেখযোগ্য। এই দুই গ্রন্থে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম দাসের জীবনীসহ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ইতিহাস আলোচনায় এই দুই গ্রন্থের মূল্য থাকিলেও সাহিত্যের আসরে ইহাদের উল্লেখযোগ্য কোন স্থান নাই।

